সংকলন

জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০০৫

৭-২১ আগস্ট

হাওর-বাঁওড় প্লাবনভূমি
মৎস্য চাষের সোনার খনি

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

সংকলন

জাতীয় মৎস্য পক্ষ–২০০৫

প্রধান সম্পাদক

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
মোঃ গোলাম হোসেন
মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম
বেগম আনওয়ারী
খন্দকার লুৎফুন্নেছা
মোঃ মঞ্জুর কাদির
মোঃ আমিনুল ইসলাম
মোঃ কফিল উদ্দিন কাইয়া
এ, বি, এম জাহিদ হাবিব
মোঃ আবুল হাশেম সুমন
মোঃ সিরাজুল ইসলাম

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ মোহসীন মিয়াজী
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০০৫

আর্থিক সহায়তায়

মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প, ফরিদপুর

প্রচ্ছদ

সৈয়দ রাকিবুল মইন রুমী
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মেকাপ ও ডিজাইন

কে, এম, রুহুল মুনির

মুদ্রণ

কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস
৮০/৪, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২০৮৮৮, ৭১১৮৭৫৯

প্রচার সংখ্যা ঃ ১০,০০০ (দশ হাজার) কপি *(কেবল সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)*

সচিব

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, আমাদের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা, অর্জন, গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য সম্পদের অবদান অপরিসীম। এ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সরকারের গৃহীত বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে জাতীয়ভাবে মৎস্যপক্ষ উদ্‌যাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। দেশের অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় তথা পুকুর-দিঘি, বিল-বাঁওড়, ডোবা-নালায় মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একর প্রতি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের বিশাল প্লাবনভূমির জলজ সম্পদকে ধাপে ধাপে মাছ চাষের আওতায় আনতে হবে। পরিবেশ বান্ধব লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং সহনশীল মৎস্য আহরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদেরকে উৎসাহী এবং উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জাতীয়ভাবে মৎস্যপক্ষ-২০০৫ উদ্‌যাপন কর্মসূচি এ সংক্রান্ত একটি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকরী কর্মপ্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি। জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) এর আলোকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goals) অর্জনে এ ধরণের কর্মসূচি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ মৎস্য খাতকে কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে। ১৯৯৩ সনে সরকার কর্তৃক প্রথমবারের মত "মৎস্য পক্ষ" উদ্‌যাপন করা হয়। এ সেক্টরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করায় দেশে মাছ চাষ দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর বিস্তারিত কর্মসূচির মাধ্যমে ৭-২১ আগস্ট, ২০০৫ পর্যন্ত জাতীয় মৎস্য পক্ষ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণের নিকট মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এ সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্যচাষকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে মৎস্য পক্ষের কার্যক্রমসহ সকল কর্মকাণ্ডে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করি।

মোঃ আবদুল করিম
সচিব

মুখবন্ধ

স্মরণাতীত কাল হতেই এ দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, প্লাবন ভূমি, পুকুর-দিঘিতে যেমন রয়েছে প্রায় ২৬০ প্রজাতির স্বাদু পানির মাছ তেমনি বিশাল বিস্তৃত সামুদ্রিক জলরাশিতে রয়েছে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পুষ্টির যোগান, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সম্ভাবনাময় এ মৎস্য সম্পদ এর ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং দেশের জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রতি বছর "জাতীয় মৎস্য পক্ষ" উদযাপন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরেও আগামী ৭ আগস্ট-২১ আগস্ট, ২০০৫ পর্যন্ত পক্ষকাল ব্যাপী মৎস্য পক্ষ উদযাপন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি সনের মৎস্য পক্ষের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো **"হাওর, বাঁওড়, প্লাবনভূমি মৎস্য চাষের সোনার খনি।"** 'জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০০৫' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করার ফলে এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং সরকারের সূচিত রূপালী বিপ্লবকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করবে।

"জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০০৫" উপলক্ষ্যে এবারও মৎস্য বিষয়ক স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। স্মরণিকায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ সমূহ মৎস্য খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য ও চিংড়ি চাষী, মৎস্যজীবী, মৎস্য রপ্তানীকারক, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মী, পরিকল্পনাবিদ, নীতি নির্ধারক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক এবং এ পেশায় নিয়োজিত সর্বস্তরের জনগণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করি। মৎস্যচাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা গণমুখী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। আলোচ্য সংকলনটি এ ধারাবাহিকতার একটি অংশ।

স্মরণিকা প্রকাশনায় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সার্বিক দিক-নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা ও মূল্যবান পরামর্শের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্মরণিকা সম্পাদনা পর্ষদের সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যাঁদের ঐকান্তিক পরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে স্মরণিকাটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলকে এ কাজের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২৭.৭.০৫

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, ঢাকা।

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
১।	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের ভূমিকা	মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	১১
২।	মৎস্য শিল্পের সার্বিক বিকাশে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	শরীফ তৈয়বুর রহমান	১৬
৩।	প্লাবন ভূমি মৎস্যচাষ উদ্যোক্তা উন্নয়নে দাউদকান্দি মডেলের সফলতা	মোঃ নজরুল ইসলাম	১৮
৪।	দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব	মরহুম ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান	২২
৫।	নালী বিলের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক একটি উদ্যোগ	ড. আইনুন নিশাত	২৪
৬।	বাংলাদেশের রুই কাতলার একমাত্র প্রজনন ভূমি হালদা নদীঃ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ আলী আজাদী	২৭
৭।	মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা	শাইখ সিরাজ	৩২
৮।	কার্পের সাথে দেশীয় ছোট ও মাঝারী মাছের মিশ্রচাষ, সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ	ফারুক-উল-ইসলাম	৩৬
৯।	মৎস্য সেক্টরে মাইক্রোক্রেডিট এর গুরুত্ব	মোঃ এহসানুল বারী	৪২
১০।	পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে ছোট মাছের ভূমিকা	ড. এম. নিয়ামুল নাসের	৪৫
১১।	বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	মাকসুদুর রহমান	৪৭
১২।	মাৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ	ড. আনোয়ারা বেগম শেলী	৫০
১৩।	মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণে সংক্রমণের উৎস শনাক্তকরণের গুরুত্ব	মোঃ মোকাম্মেল হোসেন	৫৪
১৪।	জাটকাকে ইলিশ হতে দিন	সুবোধ চন্দ্র ঢালী	৫৯
১৫।	ইলিশ মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কৌশল	ড. জি সি হালদার	৬২
১৬।	গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা	মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম	৬৬
১৭।	ব্রুড মাছ উন্নয়নে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প	বেগম আনওয়ারী	৬৮
১৮।	দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়নে মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমিকা	ড. মোঃ মমতাজ উদ্দিন	৭২
১৯।	সমাজভিত্তিক টেকসই মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা	মোঃ মাহবুবুর রহমান খান	৭৬
২০।	মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধিকল্পে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	মোঃ কফিল উদ্দিন কাইয়া	৮১
২১।	জীবিকার নিরাপত্তার জন্য উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন প্রকল্প ও মৎস্যজীবীদের প্রত্যাশা	জাফর আহমেদ	৮৬
২২।	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সাফল্য	মোঃ আলি-উর-রেজা	৯১
২৩।	ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্ভাবনা	ড. মোঃ ফজলুল আউয়াল মোল্লাহ	৯৪
২৪।	দারিদ্র্য বিমোচনে প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্য খাত	ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ	৯৮

২৫।	হোয়াইট স্পট সিন্ড্রোম ভাইরাস রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনে সমস্যা ও সুপারিশ	ড. মাহমুদুল করিম	১০২
২৬।	বাঁশের খাঁচায় কাঁকড়া চাষ	ড. মোহাম্মদ জাফর	১০৭
২৭।	পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য পরিবহণ ও বিপণন	ইন্দু লাল চাকমা	১১০
২৮।	দূষণমুক্ত সাগর সুস্থ সবল অর্থনীতির পূর্বশর্ত	ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন খান	১১৩
২৯।	জলাভূমি সম্পদ সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে মাচ্ (MACH) প্রকল্প	ফখরুল ইসলাম	১১৭
৩০।	প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ	ফেরদৌস আরা বেগম	১২০
৩১।	প্লাবন ভূমিতে ধান ও মাছ উৎপাদনে স্লুইস গেটের ব্যবহার	মোঃ লিয়াকত আলী	১২২
৩২।	মাৎস্য বিজ্ঞান শিক্ষা ঃ মাধ্যম দূরশিক্ষণ	ড. মোঃ শাহ আলম সরকার	১২৭
৩৩।	বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে সুন্দরবন জলাশয়ের ভূমিকা	জে. কে. বিশ্বাস	১৩০
৩৪।	Fisheries Resources Information of Bangladesh		
৩৫।	Annual Total Catch and Area Productivities by Sector of Fisheries for July 2003 – June 2004		
৩৬।	Year-wise Fish Production of Bangladesh		
৩৭।	Export of Fish and Fish-Product from Bangladesh		
৩৮।	Shrimp Catch		
৩৯।	জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০০৫ এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচি		
৪০।	জাতীয় মৎস্য পক্ষ- ২০০৫ এর অনুমোদিত কর্মসূচি (জেলা পর্যায়ে)		
৪১।	জাতীয় মৎস্য পক্ষ- ২০০৫ এর অনুমোদিত কর্মসূচি (উপজেলা পর্যায়ে)		
৪২।	জাতীয় মৎস্য পক্ষ- ২০০৫ পুরস্কারের জন্য মনোনীত ব্যক্তিগণের তালিকা		
৪৩।	প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর		
৪৪।	মৎস্য চাষ উপকরণসমূহের প্রাপ্তিস্থান	মোঃ আবুল হাশেম সুমন	

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের ভূমিকা
(Role of Fisheries Sector in Socio-Economic Development of Bangladesh)

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

Abstract

Fisheries sector is playing a very vital role regarding employment generation, animal protein supply, foreign currency earning and poverty alleviation. According to the report of BBS (2003-2004), fisheries sector is contributing 5.71% of the total export earning and 4.92% to the GDP. About 12 million people are directly or indirectly involved in this sector. Labour employment in this sector has been increasing approximatly by 3.5% annually. Fish production in ponds, lakes, borrowpits, floodplains, oxbow lakes, and semi-closed water bodies are increasing day-by-day through transfer of modern technology. Fish production has been increased to 21.02 lakhs MT in 2003-04, which was 17.81 lakhs MT in 2000-2001. During 1980's about 95% fish spawn used to be collected from natural sources. Currently more than 98% spawn is produced in the hatcheries. More than 4 lakhs beneficiaries (Unemployed youth, landless people, farmers, fishermen, and destitute women) have been provided training in the year 2003-2004. Last four years 265,000 farmers received 56.24 crore taka as micro credit from various projects as well as revenue budgets of Department of Fisheries (DoF). Fish production in some floodplains increased from 150 kg/ha to 2000-3000 kg/ha in recent years. In 2004-2005 the highest ever export earning of taka 2572 crore was earned through export of 633378 MT shrimp and fish products. Appropriate steps have been undertaken by the Department of Fisheries and other public and private institutions for the alleviation of poverty, employment generation, and export earning through boosting fish and shrimp production, management of inland fisheries through community participation, infrastructure development, human resource development, sanctuary establishment and need based technology dissemination.

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে মৎস্য সাব-সেক্টর আবহমান কাল হতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানো, মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন, পল্লী অঞ্চলের বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণকল্পে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইন প্রণয়ন করা ইত্যাদি মৎস্য অধিদপ্তরের দায়িত্ব। বিগত ২০০৩-২০০৪ সালের তথ্যানুযায়ী জাতীয় আয়ের প্রায় ৪.৯১%, জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৬% মৎস্য সেক্টরের অবদান। কৃষি সম্পদ হতে প্রাপ্ত মোট আয়ের ২৩% এসেছে মৎস্য সাব-সেক্টর থেকে। এছাড়া দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫.৭১% আসে মৎস্য সেক্টর থেকে। দেশের প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য মৎস্য খাতের ওপর নির্ভরশীল। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, মৎস্য সেক্টরে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির বার্ষিক হার ৩.৫% এর চেয়ে অধিক। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬৩ শতাংশ আসে মাছ থেকে। বিগত ২০০২-০৩ অর্থ বছরে আমাদের মোট উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ২১.০২ লক্ষ মেঃ টন। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় মৎস্য সেক্টর মূলতঃ সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এসব কর্মকাণ্ডের জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১১টি বিনিয়োগ ও ৪টি কারিগরি প্রকল্পসহ মোট ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৯৮.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া, চলতি অর্থ বছরে ১৬টি বিনিয়োগ ও ৬টি কারিগরি প্রকল্পসহ মোট ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১০৮.০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

ষাট ও সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮০% এর অধিক আহরিত হতো মুক্ত জলাশয় হতে। বিগত ১৯৭০-৭১ সালে মাছের মোট

উৎপাদন ছিল প্রায় ৮.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জনসংখ্যার নিরিখে তখন মাথাপিছু দৈনিক প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২১ গ্রাম, যা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। আশির দশকের শুরু থেকে সাধারণভাবে জনগণের মাঝে মাছচাষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি, পশুসম্পদ ও মৎস্যচাষে তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় মৎস্য খাতের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ হয় বেশি। সেজন্য একেবারে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের পক্ষে মাছচাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছিল কম। সরকারের ঋণ সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপকরণ নিশ্চিতকরণ ও অন্যান্য আনুসংগিক সহায়ক কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে মাছচাষে সম্পৃক্ত হতে থাকে। একসময় যে মাছচাষ ছিল অনেকটা সৌখিন পেশা, বর্তমানে তা আয় ও কর্মসংস্থানের অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধনী, দরিদ্র উভয় শ্রেণির মানুষ মাছচাষ থেকে উপকৃত হচ্ছে। বিশেষতঃ মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণসমূহ সহজলভ্য হওয়ায় দেশের পশ্চাৎপদ মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এর ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থনের ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের সূচনা হয়।

কর্মসংস্থানে মৎস্য খাতের অবদান

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ৩ বছরে মৎস্য খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্ষুদ্রঋণ প্রবাহ সৃষ্টির আওতায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ যাবৎ সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের আওতায় ৫০,৩৯৮ জন মৎস্যচাষি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা পেয়েছেন। এছাড়া, বিগত চার বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্বখাতে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ৫৬.২৪ কোটি টাকা প্রায় ২ লক্ষ ৬৫ হাজার সুফলভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে মৎস্য খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সহজীকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ঋণসীমা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সরকারি খাতের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থা মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে এবং নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় ঋণদান, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সামাজিক সচলীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ অবদান রেখে আসছে। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পাশাপাশি ব্যক্তি উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মৎস্যচাষ সহায়ক বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে উঠেছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ মাছচাষকে একটি শিল্প হিসেবে বিবেচনায় রেখে মৎস্য খাতের উন্নয়ন তথা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্যহ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক প্রায় ৫০ হাজার নৌযান উপকূলীয় মৎস্য আহরণে নিয়োজিত। প্রতিটি যান্ত্রিক নৌযানে গড়ে ৮-১০ জন লোক কাজ করে। সে হিসেবে বর্তমানে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ২১,০১৬টি নৌযানে প্রায় ২.০০ লক্ষ মৎস্যজীবী মৎস্য আহরণে নিয়োজিত। এছাড়া অযান্ত্রিক ২২,১২০টি নৌযানে প্রায় ৭০ হাজার মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থান হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি অযান্ত্রিক নৌযানে ২-৪ জন মৎস্যজীবী কাজ করে থাকেন। অতএব যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত প্রায় ২.৭০ লক্ষ মৎস্যজীবীর পরিবারের ন্যূনতম ১৩.৫০ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মাধ্যমে। এছাড়া চিংড়ি খাতে হ্যাচারি, পিএল উৎপাদন, পোনা উৎপাদন, চিংড়ি চাষ, চিংড়ি পোনা পরিবহন ও বিপণন, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা সব মিলিয়ে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। মৎস্য খাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে ইলিশ আহরণ। এখাতে প্রায় বার্ষিক ২০-২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এছাড়া প্লাবনভূমিতে মাছচাষ বর্তমানে দেশব্যাপী কর্মসংস্থানের নবদিগন্তের সূচনা করেছে। কেবলমাত্র বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে প্রায় ২৫০টি সমিতি প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষে জড়িত। এসব সমিতির গড় সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। সে হিসেবে কেবলমাত্র কুমিল্লা অঞ্চলে প্রায় ০.৭৫ লক্ষ লোক প্লাবনভূমিতে মাছচাষ, পোনা ব্যবসা, মাছ আহরণ ও বিপণন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলেও অনুরূপভাবে প্লাবনভূমিতে বিশেষতঃ ধানক্ষেতে ধানের পরে মাছের চাষ কার্যক্রম ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের স্বকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্যখাত সুনির্দিষ্ট অবদান রেখে আসছে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, প্লাবনভূমিতে মাছচাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রায় ১৪.২৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া জলমহালসমূহে সমাজভিত্তিক মৎস্য

ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালুর ফলে ব্যাপক সংখ্যক মৎস্যজীবীর মাছ আহরণ, পোনা ব্যবসা, মাছ বিক্রয়, জাল তৈরী ও অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বকর্ম সংস্থান হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তার লক্ষ্যে বর্তমান অর্থ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ১০টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২০৬৭.৬৯ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। বিগত ৩ বছরে এসব প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৮.০৪ লক্ষ সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশব্যাপী মাছচাষের ক্ষেত্রে গণজাগরণ সৃষ্টি হওয়ার ফলে কোন পুকুর আর চাষবিহীন অবস্থায় পতিত ফেলে রাখা হচ্ছে না। তবে, এসব পুকুর-দিঘিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনাতনী পদ্ধতিতে মাছচাষ হয়ে থাকে। নব নব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব পুকুরের উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে পুকুরে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ হেক্টর প্রতি বার্ষিক প্রায় ৩ মেঃ টন। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বকর্ম সংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির ফলে মৎস্যখাতে জড়িত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যহ্রাসে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে।

আমিষ সরবরাহ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা, উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু, মানুষের চাহিদা, আর্থিক সক্ষমতা ইত্যাদি আমিষ উৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী প্রাণিজ আমিষের জন্য মূলতঃ মাংসের ওপর নির্ভরশীল। এশিয়া মহাদেশের মাঝে জাপান, চীন, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রাণিজ আমিষের সিংহভাগ যোগান আসে মাছ থেকে। অনুরূপভাবে অসংখ্য নদীবেষ্টিত নিচু পাললিক সমভূমির বাংলাদেশে প্রকৃতিগত কারণেই মাছ উৎপাদনে অফুরন্ত সম্ভাবনা বিরাজমান বিধায় বর্তমানে প্রাণিজ আমিষের ৬৩% যোগান আসে মাছ থেকে। বিগত ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৭.৮১ লক্ষ মেঃ টন ও ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২১.০২ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়িয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্যখাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বিগত ১৯৯৯-২০০০ সালে বাংলাদেশ থেকে ৩৯৩৯১ লক্ষ মেঃ টন মৎস্য ও চিংড়ি রপ্তানি করে ১৮১১.৫৬ কোটি টাকা আয় হয়। বিগত ৪ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে মৎস্য ও চিংড়ি রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪১৪১ লক্ষ মেঃ টন, আর্থিক মূল্যে ২৩৬৩.৪৭ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরে মৎস্য ও চিংড়ি রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৩৩৩৭.৯৩ মেঃ টন। আর্থিক মূল্যে রপ্তানির পরিমাণ ২৫৭২ কোটি টাকা। বিগত ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৩-২০০৪ পর্যন্ত ৫ বছরের রপ্তানির পরিমাণ ও অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা চার্টে প্রদর্শিত হলোঃ

চার্ট-১ঃ বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

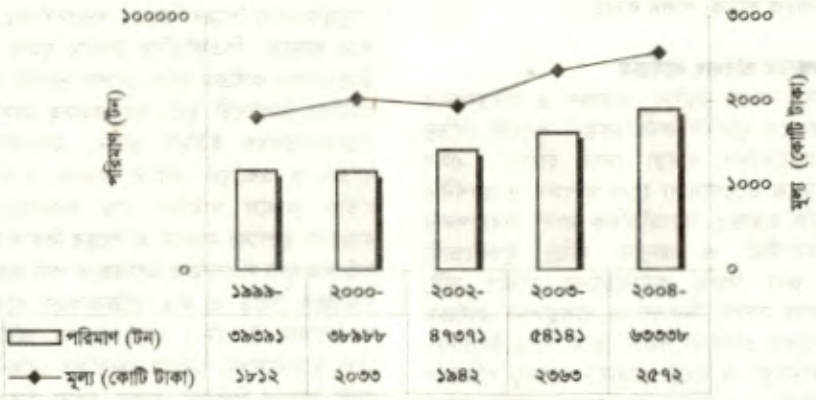

	১৯৯৯-	২০০০-	২০০২-	২০০৩-	২০০৪-
পরিমাণ (টন)	৩৯৩৯১	৩৮৯৮৮	৪৭৩৭১	৫৪১৪১	৬৩৩৩৮
মূল্য (কোটি টাকা)	১৮১২	২০৩৩	১৯৪২	২৩৬৩	২৫৭২

মৎস্য পণ্য রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সফলতা লাভের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে সরকার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। যথা- সংশ্লিষ্ট চাষিদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান, কাঁচা পায়খানা অপসারণ,

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন। ফলে স্বল্পতম সময়ে উৎপাদনস্থল থেকে প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, ডিপোতে চিংড়ি পরিবহন অনেক সহজসাধ্য হয়েছে, অবতরণ কেন্দ্রসমূহের মানোন্নয়নের ফলে অবতরণ স্থলে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাদির প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে, বরফ দেয়ার ব্যবস্থা সহজীকরণের মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জে খামার/উৎপাদন কেন্দ্রের কাছাকাছি বরফ দেয়ার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এতে চাষিরা সহজে মাছের গুণগতমান সংরক্ষণে সক্ষম হবেন। এছাড়া মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। ফলে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং ব্যবস্থায় HACCP পদ্ধতি অনুসরণ অনেক সহজ হয়েছে, চিংড়ি গবেষণার জন্যে যন্ত্রপাতি আমদানিসহ ল্যাবরেটরির মানোন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত নয় এরূপ ডিপো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট মালিককে জরিমানা করা হয়েছে। চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা গুণগত মানোন্নয়নের জন্য মানসম্মত খাদ্য উৎপাদন অত্যন্ত জরুরী। এলক্ষ্যে মৎস্য খাদ্য আইন প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে চিংড়ি উৎপাদন ও মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়েছে।

প্রচার মাধ্যমের সহায়ক ভূমিকা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জনগণের মাঝে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক পুস্তক, পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টারসহ অন্যান্য সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। তবে সরকারের কার্যক্রমের পাশাপাশি টেলিভিশন, রেডিও, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসহ গণমাধ্যম মৎস্য খাতের বিকাশে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম

দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর, সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যজীবী ও অন্যান্য দরিদ্র সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চিংড়ি উৎপাদন, বিপণন, মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানী প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন সাধন, জীববৈচিত্র্য ও বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য প্রজাতি রক্ষার জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন, দাউদকান্দি এলাকায় প্লাবনভূমিতে মাছচাষ কার্যক্রমে যে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা দেশব্যাপী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি।

অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম

জাতীয় চাহিদার নিরীখে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই) ইতোমধ্যে মৎস্য প্রজনন, মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৩৬টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ও সাম্প্রতিককালে সম্প্রসারিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি হলো উন্নত জাতের হাইব্রিড মাগুরের চাষ, শিং মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, ফসলচক্রভিত্তিক পরিবেশ সহনীয় সামুদ্রিক চিংড়ি ও মাছের চাষ, তেলাপিয়া পোনা ব্যবহারে পুকুরে ভেটকির চাষ ইত্যাদি। ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এসব পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় ১৯৯০-৯১ সাল থেকে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে অন্তঃ প্রজনন সমস্যার কারণে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার গুণগতমান উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় অপ্রচলিত মৎস্য প্রজাতির প্রজনন, জাত উন্নয়ন ও চাষকৌশল উদ্ভাবন, প্রচলিত মৎস্য পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিপন্ন প্রজাতির মাছের চাষ, ছোট মাছের চাষ, মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্যে এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতি নির্ধারণ, মৎস্য পণ্য বিপণন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রমের ওপর ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম

দেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং আহরণ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রকার অবকাঠামোমূলক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিএফডিসি দেশের সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পের বিকাশে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএফডিসির মাধ্যমে গৃহীত ও পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো-দেশের দূরবর্তী অঞ্চলে ফিশিং গ্রাউন্ডের নিকটবর্তী স্থানে বরফকলসহ মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ ইউনিট স্থাপন, মৎস্যজীবীদের মাঝে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান বিতরণ, ঢাকা মহানগরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ বাজারজাতকরণ, জাল কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে এ শিল্পের বিকাশ সাধন, দেশের সর্বপ্রথম মূল্য সংযোজিত মৎস্যজাত পণ্য প্রস্তুত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিংড়ি ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনে সহায়তাদান ইত্যাদি। কর্পোরেশনের ভবিষৎ কার্যসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য- চট্টগ্রাম বন্দরস্থিত বেসিন পুনর্বাসনসহ মাল্টি চ্যানেল পিপওয়ে স্থাপন, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পাইকারী মৎস্য বাজার সম্প্রসারণ, বঙ্গোপসাগরে টুনা, ম্যাকারেল, শ্যাড, হেরিং ইত্যাদি পেলাজিক মৎস্য সম্পদের মজুদ অনুসন্ধান ইত্যাদি।

মেরিন ফিশারিশ একাডেমীর কার্যক্রম

মৎস্য কলাকৌশল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মৎস্য আহরণ বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় মেরিন ফিশারিজ একাডেমী রয়েছে। এখানে মৎস্য আহরণ, নেভিগেশন, শিপ ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শাখায় স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রায় সকলেই দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জাহাজ/ট্রলারে উচ্চ বেতনে চাকুরির সুযোগ পান। বিগত তিন বছরে এই একাডেমী হতে ১৭২ জন ক্যাডেট স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে বের হয়ে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত আছেন।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচেছ। সামাজিক সচলিকরণ, প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান, ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ, মৎস্যজীবীদের ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় ৭৫টি জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও সহায়ক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। সুফলভোগীদের দোড়গোড়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের সফল বাস্তবায়নে এনজিওসমূহ সহায়ক সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়া, দেশব্যাপী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী, জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিও তৃণমূল পর্যায়ে নিজস্ব অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উপসংহার

বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্র বেগবান ও প্রশস্ত হয়েছে। মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ফিসপাস নির্মাণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদারকরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এ বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০০৫ উদ্বোধন করার মাধ্যমে রূপালী বিপ্লবের কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরের প্রয়াস সফল করার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। চলতি বছর জাতীয় মৎস্য পক্ষ উদযাপনে স্লোগান **হাওর বাঁওড় প্লাবনভূমি-মৎস্যচাষের সোনার খনি** এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সরকারি-বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মাছ চাষি, মৎস্যজীবী, জনপ্রতিনিধিসহ সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০০৫ সফলভাবে উদযাপনের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করি।

মৎস্য শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
(Role of Bangladesh Fisheries Development Corporation in Fishery Industry Development)

শরীফ তৈয়বুর রহমান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

Abstract
Bangladesh Fisheries Development Corporation (BFDC) is a public sector corporation was established in 1964. The corporation has remained fully dedicated to the development of fisheries in Bangladesh specially in the field of marine fisheries. After establishment of BFDC in 1964, the country crossed the threshold of new era in the field of fisheries development in so far as the number of commercial fishing trawlers increased from zero to 105, that of mechanized fishing boats from few dozens to about 22000. Fish processing industries increased from 5 to 130 and the overall increase in marine fish catch from 90,000 metric tons in 1974-75 to 4,67,000 metric tons in 2003-04. BFDC acted as a pathfinder in these development.

বঙ্গোপসাগরে মাছ আহরণ করে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মিটানোর জন্য বিগত ষাটের দশকে দেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং আহরণ প্রক্রিয়ায় অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য সরকারী খাতে একটি সংস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান অর্ডিনেন্স নং ৪ অনুযায়ী ইষ্টপাকিস্তান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর ১৯৭৩ সালের এ্যাক্ট নং- ২২ দ্বারা তা বাতিল করে **বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন** হিসেবে নতুন ভাবে নামকরণ করা হয়। এ কর্পোরেশন সরকারী মালিকানাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিবেদিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে অবকাঠামো স্থাপন এবং সেবামূলক কার্যক্রমসহ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে দেশের মৎস্য ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন সাধন।
- গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য পথিকৃত হিসেবে ভূমিকা পালন।

কার্যক্রম
- মৎস্য সম্পদ এবং মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
- মৎস্য শিল্প স্থাপন
- মাছ ধরার ইউনিটসমূহ স্থাপন এবং মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য উন্নততর মৎস্য আহরণ সুবিধাদি স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- মৎস্য শিল্প উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার নৌকা, ফিশ কেরিয়ার, নদী ও সড়ক পথে চলাচলযোগ্য যানবাহন ক্রয়-বিক্রয় ও পরিচালনা
- মৎস্য ও মৎস্য-সামগ্রী সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও বিপণনের জন্য ইউনিট স্থাপন
- মৎস্য সম্পদের জরীপ ও গবেষণাকার্য পরিচালনা করা
- মৎস্য শিকার, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন ও পরিচালনা
- মৎস্য ও মৎস্য সামগ্রী বাজারজাতকরণ/রপ্তানি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প স্থাপন।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে কর্পোরেশনের অবদান
কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন ও অবকাঠামোমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের মৎস্য শিল্পে বিশেষ করে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকে যেসব ক্ষেত্রে কর্পোরেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

বিএফডিসি বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের ওপর প্রথমবারের মত ১৯৬৬ হতে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা সম্পন্ন করে। এতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ, মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের অবস্থান নির্ণয়,

বাণিজ্যিক প্রজাতির মাছ শনাক্তকরণসহ মৎস্য সম্পর্কীয় মৌলিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়। এ গবেষণায় ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়। এ জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমানে ট্রলার বহর পরিচালিত হচ্ছে।

ট্রলার বহর পরিচালনায় ও শোর (Shore) ভিত্তিক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশন ১৯৭০ সালে চট্টগ্রামে দেশের একমাত্র মৎস্য বন্দর প্রতিষ্ঠা করে। একই সাথে ট্রলার ও অন্যান্য নৌযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক মেরিণ ওয়ার্কশপ স্থাপন করে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে সেবা প্রদান করে আসছে।

- বিএফডিসি বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের ওপর প্রথমবারের মত ১৯৬৬ হতে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা সম্পন্ন করে। এতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জারিপ, মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের অবস্থান নির্ণয়, বাণিজ্যিক প্রজাতির মাছ শনাক্তকরণসহ মৎস্য সম্পর্কীয় মৌলিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়। এ গবেষণায় ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়। এ জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমানে ট্রলার বহর পরিচালিত হচ্ছে।
- ১৯৭২ইং সালে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক প্রদত্ত ১০টি ট্রলারের সাহায্যে কর্পোরেশন বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ চালু করে। কর্পোরেশনের এ দিক নির্দেশনায় বেসরকারি খাত আকৃষ্ট হয়। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণের জন্য ১০৫টি ট্রলারের একটি বহর গড়ে উঠেছে। ফলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ প্রাথমিক পর্যায়ে বার্ষিক ৯০ হাজার মেঃ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালে প্রায় ৪.৬৭ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে।
- মাছের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য বরফের ব্যবহার নিশ্চিত করণার্থে কর্পোরেশন প্রথম থেকে দেশের দূর্গত অঞ্চলে ফিশিং গ্রাউন্ডের নিকটবর্তী স্থানে বরফকল ও মৎস্য অবতরণ ঘাঁটি স্থাপন করে। মাছ সংরক্ষণে ও দূরপাল্লা পরিবহনে বরফের ব্যবহার মৎস্যজীবীদের নিকট বর্তমানে বহুল পরিচিত এবং বেসরকারি উদ্যোগে বর্তমানে এই শিল্প ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে।
- দেশের আধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষ জনবলের অত্যাধিক অভাব থাকায় সূচনা লগ্নে রাশিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে ট্রলার পরিচালনার জন্য জনবল আনয়ন করতে হত। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় কর্পোরেশন ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রামে মেরিণ ফিশারিজ একাডেমি স্থাপন করে। এ একাডেমি থেকে এ যাবত প্রায় ১০০০ জনশক্তি তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় নিয়োজিত সকল প্রকার ট্রলার উক্ত একাডেমি হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল দ্বারা সাফল্যজনক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
- বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় জলসীমায় মাছ ধরার জন্য পালতোলা দেশীয় নৌকার স্থলে প্রাথমিক পর্যায়ে এ কর্পোরেশন ৭২২টি যান্ত্রিক নৌকা এবং ১৩০০টি ইঞ্জিন মৎস্যজীবীদেরকে বিতরণ করেন। ফলে বঙ্গোপসাগরে বর্তমানে প্রায় ২২ হাজারের অধিক যান্ত্রিক নৌকা মাছ ধরায় নিয়োজিত আছে।
- সামুদ্রিক মাছ উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে জনপ্রিয় হলেও দেশের অন্যান্য স্থানে তা ছিল অজানা, অচেনা ও অপ্রিয়। কর্পোরেশন সর্বপ্রথম ট্রলার দিয়ে ধরা সামুদ্রিক মাছ ঢাকা মহানগরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করায় দেশে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে।
- স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত দেশে কোন উল্লেখযোগ্য মৎস্য/চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ছিলনা। কর্পোরেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও মংলা এলাকায় চিংড়ি/মাছ প্রক্রিয়াকরণের আধুনিক কারখানা স্থাপন করে বেসরকারি মৎস্য রপ্তানীকারকদের সেবা প্রদান শুরু করে। ফলে ব্যক্তিমালিকানায় বর্তমানে দেশে প্রায় ১৩০টি রপ্তানীমুখী কারখানা স্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালে প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানী খাতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ৩ কোটি টাকা থেকে ২০০৪ সালে ২৩৬৩.৪৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।
- দেশে প্রথম বারের মত কার্পাস সূতার জালের পরিবর্তে কর্পোরেশন নাইলন সূতার জাল প্রচলন করে এবং ৩ টি জাল কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে এ শিল্পের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফলে দেশে বর্তমানে ৩৫টি আধুনিক জাল কারখানা গড়ে উঠেছে।

কর্পোরেশনের কর্মকান্ড বৃদ্ধি/ ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর প্রস্তাবনা

- ঢাকা মহানগরে আধুনিক মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প।
- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরস্থিত বেসিন পুনর্বাসন সহ মাস্টি চ্যানেল সিপওয়ে স্থাপন প্রকল্প।
- মহীপুর/আলীপুর, পটুয়াখালীতে মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার স্থাপন প্রকল্প।
- উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে মৎস্য বাজার উন্নয়ন প্রকল্প।
- বঙ্গোপসাগরে টুনা, ম্যাকারেল, শ্যাড,হেরিং ইত্যাদি পেলাজিক মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনা ও মজুদ অনুসন্ধান প্রকল্প।
- মূল্য সংযোজিত মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রকল্প।

প্লাবনভূমি মৎস্যচাষ উদ্যোক্তা উন্নয়নে দাউদকান্দি মডেলের সফলতা
(Floodplain Aquaculture Entrepreneurship Development A Success of Daudkandi Model)

মোঃ নজরুল ইসলাম
পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract

The lowlying crop land in Daudkandi area is converted into semi-closed water bodies due to construction of rural roads and other water management infrastructures. Utilising these local resources, carp polyculture system has been adopted in the extensive area of semi-closed floodplain. Over-wintered fish seed of local and exotic carp species stocked at the rate of 1500-2000 per acre in the early monsoon and reared for 6 –7 months during June to November. Since 1986 a total 73 floodplain aquaculture farms with a total of 7.70 thousand acres of floodplain land so far been developed, involving all categories of local farmers. In 2003 a total of 3.58 thousand tones of fish produced with a production of 400-600 kg per acre. Gross income of about Tk. 17.90 crore has been earned against running capital cost of Tk. 9.55 crore. The profit shared among the farmers based on their investment as land, running capital and labour. The income of farmers increased significantly at a rate of Tk. 4-5 thousand per acre as lease value, Tk.1.5-2 thousand as devancher per thousand taka share, Tk 40-50 thousand per small scale business unit related to aquaculture and TK. 8-10 thousand per fisherman. Considering the success of rotation croping system of paddy cultivation in the dry season and aquaculture in the monsoon season, the environment friendly and community based floodplain aquaculture system of Daudkandi model may be extended to other suitable semi-closed floodplain areas.

দাউদকান্দি উপজেলা মেঘনা–গোমতী অববাহিকায় নিচু ভূমির কৃষি-নির্ভর অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। উপজেলার আয়তন ৩১৮ বর্গকিলোমিটার, চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৭২ হাজার একর। বিগত সত্তর দশক হতে কৃষি খামার পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসায় শুষ্ক মৌসুমে সেচভিত্তিক-উচ্চ-ফলনশীল ধানসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল উৎপাদন প্রসার লাভ করে। ফলে বর্ষা মৌসুমে এলাকার প্লাবিত জমি অব্যবহৃত অথবা কম ব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকত। এলাকায় গ্রামীণ সংযোগ রাস্তা নির্মাণের ফলে কৃষি জমি ও বিলগুলো বর্ষাকালে আধাবদ্ধ জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সীমিত পরিসরে কিছু আগ্রহী উদ্যোক্তা দ্বারা আধাবদ্ধ প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম শুরু করা হয়। সকল শ্রেণির কৃষকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফলভাবে বাণিজ্যিকভিত্তিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম বিস্তার ঘটায়। এ প্রক্রিয়ায় প্লাবনভূমি মৎস্যচাষ উদ্যোক্তা উন্নয়নে দাউদকান্দি মডেল হিসেবে সমধিক প্রসার লাভ করে।

প্লাবনভূমির উপযোগী মৎস্যচাষ পদ্ধতি

প্লাবনভূমির মৎস্য চাষে মূলতঃ স্থানীয় মৎস্য চাষিদের অভিজ্ঞতার আলোকে দ্রুতবর্ধনশীল দেশী ও বিদেশী কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। 'ট্রায়াল এন্ড এরর' পন্থায় বদ্ধ জলাশয়ে মাছের মিশ্রচাষ প্রযুক্তি পর্যায়ক্রমে বিস্তীর্ণ আধাবদ্ধ প্লাবনভূমির উপযোগী করা হয়। আধাবদ্ধ প্লাবনভূমির পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতার ওপর ভিত্তি করে সকল স্তরের জলজ তৃণভোজী মাছের মধ্যে গ্রাসকার্প ও থাই সরপুঁটি; উপরের স্তরের প্ল্যাংকটনভোজী কাতলা, সিলভারকার্প ও বিগহেডকার্প; মধ্যস্তরের রুই, ঘনিয়া, ভাগনা, বাটা এবং নিম্নস্তরের মৃগেল, কালিবাউশ, কার্পিও ইত্যাদি প্রজাতির বড় পোনা একর প্রতি ১৫০০-২০০০ হারে মজুদ করে পরিচর্যা করা হয়। তবে পোনার প্রাপ্যতা

এবং প্লাবনভূমির উৎপাদশীলতার ওপর ভিত্তি করে খামার পর্যায়ে পোনা মজুদের সংখ্যা ও প্রজাতিগত কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্লাবনভূমির আধাবদ্ধ জলাশয়ে পানি ধারণের সীমিত সময়ে ভাল ফলন পাওয়ার জন্য জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সার ও সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করা হয়। উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মাছের উৎপাদিত ফসল বহুমুখীকরণের জন্য ইদানিং কার্পজাতীয় মাছের সাথে উচ্চ ফলনশীল পাঙ্গাস ও মনোসেক্স জাতের গিফট তেলাপিয়া মজুদ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আধাবদ্ধ প্লাবনভূমিতে বিদ্যমান জলাশয় পার্শ্ববর্তী উন্মুক্ত জলাশয়ের সাথে সংযোগ রেখে প্লাবনভূমির বিস্তীর্ণ মৎস্য খামারে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত অনেক প্রজাতির দেশীয় মাছ উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয় গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্লাবনভূমিতে দ্রুতবর্ধনশীল কার্পজাতীয় মাছের মিশ্র চাষের ফসলের সাথে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত বৈচিত্র্যময় প্রজাতির মাছের সহাবস্থানে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত একটি লাগসই মৎস্যচাষ প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গুণগতমান সম্পন্ন পোনা উৎপাদন

এলাকার নিম্নাঞ্চলের প্লাবনভূমির মৎস্যচাষ কার্যক্রম আরম্ভ করার প্রথম দিকে এলাকায় কোন মৎস্য হ্যাচারি বা নার্সারি ছিলনা। দূরদূরান্ত থেকে বড় পোনা ক্রয় করে আনতে একদিকে পরিবহন খরচসহ পোনার মূল্য বেশি পড়ে। অন্যদিকে পোনা পরিবহন সময়ে মড়ক ও রোগ বালাইয়ের ঝুঁকি থাকে। এ ধরনের সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্থানীয়ভাবে মৎস্য পোনা উৎপাদন করার জন্য উদ্যোক্তাদের দ্বারা এলাকায় কয়েকটি ছোট আকৃতির মৎস্য হ্যাচারি এবং অনেকগুলো নার্সারি স্থাপন করা হয়। উদ্যোক্তাগণ নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী গুণগতমান সম্পন্ন পোনা মাছ নিজ নিজ খামার এলাকায় উৎপাদন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমানে উন্নয়নকৃত প্লাবনভূমির মৎস্যচাষ খামারের আওতায় প্রায় দশহাজার একর জলায়তনে বছরে ১০-২০ সেন্টিমিটার আকৃতির প্রায় দুই কোটি বড় পোনা তৈরি করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে স্থাপিত ছোট হ্যাচারিগুলো আধুনিকীকরণ করে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলে বর্তমান পোনা উৎপাদন চাহিদা পূরণ হবে। ভবিষ্যতে মৎস্যচাষ খামার এলাকা আরও সম্প্রসারিত হলে উদ্যোক্তা কর্তৃক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে গুণগতমান সম্পন্ন পোনার চাহিদা স্থানীয়ভাবেই উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্লাবনভূমিতে মাছচাষের সফলতা নির্ভর করে দ্রুত বর্ধনশীল জাতের বড় পোনা উৎপাদন করার ওপর। হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেনু পোনা থেকে প্রথম ধাপে আঙ্গুলে পোনা এবং দ্বিতীয় ধাপে আঙ্গুলে পোনা থেকে নলা পোনা উৎপাদন করা হয়। এলাকার গৃহস্থালি পুকুর, পথিপার্শ্বিক ডোবা- নালা ও খালে বড় পোনা উৎপাদনের নার্সারি পরিচালনা করা হয়। এলাকার প্লাবনভূমির মৎস্যচাষ কার্যক্রমে বিগত বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্লাবনভূমির বিস্তীর্ণ মৌসুমি জলাশয়ে মজুদকৃত পোনার আকৃতির সাথে মাছের উৎপাদন সরাসরিভাবে নির্ভরশীল। তাই নার্সারি পুকুরে প্রতিপালন করে ওভারউইন্টারড বা চাপের পোনা উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণে কাঙ্ক্ষিত আকৃতির পর্যাপ্ত সংখ্যক বড় পোনা উৎপাদন করা হয়।

পোনা মজুদ পরিচর্যা পদ্ধতি

প্লাবনভূমিতে বিস্তীর্ণ এলাকায় মৎস্যচাষ কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রজাতির পোনামাছ মজুদ করার উপযুক্ত সময় হলো মার্চ ও এপ্রিল মাস। শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্পের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জলাশয় প্রস্তুত করে পোনা মজুদের উপযোগী করা হয়। মাঠে বর্ষার পানি আসার সাথে সাথে পোনা ছাড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য প্রকৃতপক্ষে জুন হতে ডিসেম্বর ৬-৭ মাস সময় পাওয়া যায়। পোনা মজুদের জন্য এসব জলাশয়গুলো চুন ও সার প্রয়োগ করে প্রস্তুত করে নিতে হয়। জলাশয়গুলোতে একর প্রতি ১০০ কেজি হারে চুন প্রয়োগের এক সপ্তাহ পর ২০-২৫ কেজি হারে ইউরিয়া এবং ১০-১৫ কেজি হারে টি এস পি প্রয়োগ করা হলে জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্রস্তুত হয়। মাঠ শুকানোর সময় মাঠের আগাছা ও জলজ উদ্ভিদ পরিস্কার করে সেগুলো স্তূপাকারে জমা করে কম্পোষ্ট সার তৈরি করে পোনা মজুদের পর জলাশয়ে প্রয়োগ করলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য মোট জমির শতকরা প্রায় ৫ ভাগ নার্সারি তৈরি করে তাতে আগাম পোনা মজুদ করা যায়। মাঠের অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলো পোনা মজুদের জন্য প্রস্তুত হলে নিচের সারণী মোতাবেক ১০-১৫ প্রজাতির পোনা সকল স্তরে তৃণভোজী, উপরের স্তরের প্ল্যাঙ্কটনভোজী, মধ্যস্তরের জৈবভোজী এবং নিচের স্তরের তলানিভোজী যথাক্রমে ২:৩:৩:২ অনুপাতে মজুদ করা হয়। প্লাবনভূমির পানির গভীরতা, উৎপাদনশীলতা ও ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে পোনার মজুদ সংখ্যা ও প্রজাতির মিশ্রণ অনুপাত কম বেশি হতে পারে। ধানের পরে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের এসব জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হয়। তাছাড়া স্বল্প সময়ের উৎপাদন মৌসুমে মাছের ওজন দ্রুত বৃদ্ধির জন্য মোট ওজনের ২-৩% ভাগ সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। প্লাবনভূমির জলাশয়ের পানির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেলে মাসিক ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করা হয়। অক্টোবর মাসে পানি কমে যাওয়ার প্রাক্কালে প্রথম পর্যায়ে খামারে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছগুলো আহরণ করা হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চাষের মাছের মধ্যে যেসব প্রজাতির মাছ বাজারজাতকরণের উপযোগী হয় সেসব বড় মাছ আংশিক আহরণ এবং সর্বশেষ ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে সম্পূর্ণভাবে আহরণ করে বাজারজাত করা হয়।

এক একর প্লাবনভূমিতে পোনা মজুদ ও প্রজাতির মিশ্রণ পদ্ধতি

খাদ্য স্তর	প্রজাতি	পোনার আকার (সেন্টিমিটার)	মজুদ ঘনত্ব (সংখ্যা	শতকরা হার	মন্তব্য
সকল স্তরের তৃণভোজী মাছ	থাইসরপুঁটি	৫-৭	৩০০	১৫	জলজ আগাছার প্রাপ্যতার ওপর সরপুঁটি ও গ্রাস কার্প মজুদ কম বেশি হয়।
	গ্রাসকার্প	১৫-২০	১০০	৫	
উপরের স্তরের ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনভোজী মাছ	সিলভারকার্প	১২-১৫	৪০০	২০	বিগহেড এর পরিবর্তে কাতলা পোনা মজুদ করা হয়
	কাতলা	১৫-২০	১০০	৫	
	বিগহেড	১২-১৫	১০০	৫	
মধ্যস্তরের জৈবভোজী মাছ	রুই/ঘনিয়া	১০-১৫	৫০০	২৫	বাটা ও ভাগনার পোনা প্রাপ্যতার ওপর মজুদ করা হয়।
	থাই পাঙ্গাস	১২-১৫	৬০	৩	
	মনোসেক্স তেলাপিয়া	৫-৭	৪০	২	তেলাপিয়ার মনোসেক্স নিশ্চিত হয়ে মজুদ করা উচিত
নিচের স্তরের অর্ধ পচা জৈবভোজী মাছ	মৃগেল/কালি বাউশ	১০-১৫	২৫০	১২.৫	মিরর কার্পের পরিবর্তে কার্পিও পোনা মজুদ করা হয়
	কমনকার্প/ মিররকার্প	১০-১২	১৫০	৭.৫	
মোট			২০০০	১০০%	

সমাজের সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ

প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ উদ্যোক্তা উন্নয়নের মজবুত ভিত্তি হচ্ছে গ্রামের সকল শ্রেণির জনগণের অংশগ্রহণ। এধরনের ব্যক্তিমালিকানাধীন বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ কর্মসূচিতে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড সম্পাদন এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব। এলাকার সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ মৎস্যচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিস্তীর্ণ জলাশয়ে মৎস্যচাষের পুঁজি বিনিয়োগ উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ এবং শেয়ার বন্টনে কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণ, মাঠের সকল জমির মালিকদের কর্মসূচিতে অংশীদারিত্ব এবং এলাকার ভূমিহীন ও গরীব শ্রমজীবীদের মৎস্য চাষ খামার পরিচর্যা, মৎস্য আহরণ, বাজারজাতকরণ ও পরিবহন কাজে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ অর্জন করে। এলাকার অধিকাংশ মধ্যমাকৃতির ও প্রান্তিক কৃষক তাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে থাকে। সমাজের তুলনামূলকভাবে বড় কৃষক অথবা ব্যবসায়ী স্বচ্ছল শ্রেণির উদ্যোক্তাগণ তাদের অর্থ শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। অন্যদিকে শ্রমনিবিড় মৎস্যচাষ কার্যক্রমে দরিদ্র কৃষক এবং সম্পদহীন শ্রমজীবীদের সম্পৃক্ত করার অবাধ সুযোগ থাকে। প্রতিটি খামারের সকল অংশীদারদের সমন্বয়ে নিজেদের সুবিধামত দল অথবা সমবায় সমিতি অথবা যৌথ কোম্পানী গঠন করে সদস্যদের দ্বারা খামারের কারিগরি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা করে। সদস্যদের মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এলাকার স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং সমবায় সমিতিগুলো প্লাবনভূমি মৎস্যচাষ উদ্যোক্তা উন্নয়নে সঠিক নেতৃত্বের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অধিকন্তু এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির উৎপাদনমুখী নেতৃত্বে প্লাবনভূমি মৎস্যচাষ উদ্যোক্তা উন্নয়নে সফলতার ভিত্তি আরো মজবুত হয়।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন

এলাকার অধিকাংশ কৃষক মধ্যমাকৃতির ও প্রান্তিক পর্যায়ের হওয়াতে শুধুমাত্র কৃষি কাজের ওপর নির্ভর না করে তাদেরকে অন্য পেশার কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। প্লাবনভূমি মৎস্যচাষ কার্যক্রম প্রসারিত হওয়ায় মূলতঃ কৃষকদের বর্ষা মৌসুমে অবসরকালীন সময়ে নিজেদের কর্মসংস্থান ও পারিবারিক আয় বর্ধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্ষা মৌসুমে মৎস্যচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ায় মৎস্য চাষ কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পোনা উৎপাদন, সার ও খাবার সরবরাহ, চাষ মাছের পরিচর্যা, মৎস্য আহরণ, বাজারজাতকরণ, পরিবহন, আনুষঙ্গিক ব্যবসায় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ কৃষক পরিবারগুলোর উপযোগী প্রায় ৪০ হাজার শ্রম দিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে গরীব কৃষকদের পারিবারিক আয় দ্বিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বর্ষা মৌসুমে কমব্যবহৃত অথবা অব্যবহৃত পড়ে থাকা জমি থেকে একর প্রতি

৪-৫ হাজার টাকা হারে পত্তনী এবং শেয়ার বিনিয়োগকৃত অর্থের প্রায় ১.৫-২ গুণ পরিমাণ লভ্যাংশ এবং মৎস্য আহরণ বাবদ প্রতি মৌসুমে ৮-১০ হাজার টাকা, মাছের উৎপাদন সামগ্রী এবং মৎস্য বাজারজাতকরণ ব্যবসায় উদ্যোক্তা প্রতি ৪০-৫০ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি পায়। বিগত ২০০৩ সনের উৎপাদন মৌসুমে এলাকার ৭৩টি খামারে মোট ৭.৭০ হাজার একরে উৎপাদিত প্রায় ৩.৫৮ হাজার মে: টন মাছ বিক্রি করে প্রায় ১৭.৯০ কোটি টাকা আয় করা হয়। এতে খামার পরিচালনা খরচ বাবদ মৎস্য চাষিদের মোট বিনিয়োগ হয় প্রায় ৯.৫৫ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৮.৩৩ কোটি টাকা নিট মুনাফা হিসাবে নিজ নিজ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে লভ্যাংশ হিসেবে উপার্জন করে। ২০০৪ উৎপাদন মৌসুমে ৯৬টি খামার প্রকল্পে মোট ৮.৩০ হাজার একরে উৎপাদিত ৫.০৩ হাজার মে: টন মাছ বিক্রি করে ২৫.১৫ কোটি টাকা আয় করা হয়। গ্রামীণ সকল কৃষকদের আয় বর্ধনের সাথে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং এলাকার শিক্ষার প্রবৃদ্ধির হার অন্যান্য এলাকা হতে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিলক্ষিত হয়। ফলে গ্রামীণ সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্লাবনভূমি মৎস্যচাষ কার্যক্রম আশাব্যঞ্জক অবদান রেখে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। দাউদকান্দি উপজেলার এ কার্যক্রম ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী মুরাদনগর, চান্দিনা, হোমনা ও কচুয়া এলাকায় সম্প্রসারিত হয়েছে।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে সেচভিত্তিক উচ্চ ফলনশীল কৃষিজ ফসলের জমিতে অতিমাত্রায় কীটনাশক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হতো। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা ও মাটির স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয় এবং প্লাবনভূমির মাছের বিচরণ ক্ষেত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পাশাপাশি শুষ্ক মৌসুমে কৃষি ফসলের জমিতে পরিবেশবান্ধব সমন্বিত কীট-পতঙ্গ দমন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ফলে কৃষি কাজে কীটনাশক বাবদ খরচ অনেকাংশে হ্রাস পায়। বর্ষা মৌসুমে জমিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম চালু করায় জমির জলজ আগাছা জৈবিক পন্থায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। প্লাবনভূমির মৎস্য খামারে সার ও খাবার প্রয়োগ করায় জমির উর্বরা শক্তি ও কৃষি ফসলের উৎপাদন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া গ্রামীণ সংযোগ রাস্তা ও সেচ সুবিধা অবকাঠামো নির্মাণের ফলে গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়ন ও কৃষি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রাথমিক পর্যায়ে প্লাবনভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত অনেক প্রজাতির মাছের উৎপাদনের ওপর প্রভাবমূলক বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সকলের মতামতের ভিত্তিতে জলজ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য মৎস্য খামারের সাথে পার্শ্ববর্তী উন্মুক্ত জলাশয়ের সংযোগ রাখা হয়। যাতে খামার এলাকায় বর্ষার পানি অবাধে উঠা-নামা করতে পারে এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যায়। এতে বর্ষাকালে খামার এলাকাভূক্ত জলাভূমির সাথে পার্শ্ববর্তী উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ অবাধে চলাচল ও বিচরণ করতে পারে। প্লাবনভূমির আধা-বদ্ধ জলাভূমিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম গ্রহণ করায় প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ২৫-৩০ প্রজাতির মাছ প্লাবনভূমিতে প্রজনন ও বিচরণ করার সুযোগ পায়। ফলে প্লাবনভূমির মৎস্যচাষ খামার এলাকায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উপসংহার

দাউদকান্দি এলাকায় প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ কর্মসূচিতে ভূমি ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিবিড়করণ, স্থানীয়ভাবে উন্নয়নকৃত প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষের লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ, স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গুরুত্বারোপ, স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সমাজের সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বর্ষা মৌসুমে কৃষি কাজের পরিপূরক হিসেবে মৎস্যচাষ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইত্যাদি মূল্যায়ন সূচকের আলোকে প্লাবনভূমি মৎস্যচাষ উন্নয়নে একটি সফল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য এখন প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে উন্নয়নকৃত প্লাবনভূমি মৎস্যচাষের লাগসই প্রযুক্তি দেশের অন্যান্য সম্ভাবনাময় এলাকায় ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব

(Importance of Marine Fishers Resources in Economic Development of Bangladesh)

মরহুম ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান
প্রাক্তন উপাচার্য
মৌলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সন্তোষ, টাঙ্গাইল

Abstract

The marine waters under the EEZ of Bangladesh are rich in fish and fishery resources. Many of the available fishery resources are yet to be exploited inspite of the fact that repeated pressures are put on some of the resources, particularly in the shallow water areas. This is mainly due to the lack of appropriate fishing technology and the technical know-how that is needed to avail the development opportunities in one hand and the lack of stock assessment and management capabilities of the public sector agencies to address the issues of the management. Presently fishing is done up to 100-meter depth contour only that refers to one-fourth of the water area under the EEZ. The fishery resources of the rest of the area of the economic zone are naturally lost every year. The country cannot afford to continuously waste the resources in these days of protein hardship and employment crisis. Environment friendly exploitation and development needs to be undertaken so as to exploit the fish and fishery resources judiciously.

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলভাগের আয়তন হচ্ছে ১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু মৎস্য আহরণ সীমাবদ্ধ রয়েছে কেবল মাত্র ১০০ মি. গভীরতা পর্যন্ত যা মোট জলসীমার এক চতুর্থাংশ মাত্র। উপরিস্তরের (Pelagic) মাছ বস্তুতঃ এখনও অনাহরিত রয়ে গেছে। বিগত ২০০১-২০০২ ইং সনে সমুদ্র হতে উৎপাদিত ৪১০০ মেঃ টন মাছের মধ্যে ট্রলার বহরের অবদান মাত্র ২৫,০০০ মেঃ টন। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মধ্যে অদ্যাবধি ৪৭৫ প্রজাতির কাটাযুক্ত মাছ, ৫০ প্রজাতির কোমলস্থি মাছ, ২৫ প্রজাতির চিংড়ি, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির লবষ্টার, ৬ প্রজাতির ঝিনুক, ৩০১ প্রজাতির কোরাল, ৩ প্রজাতির তারা মাছ, ৪ প্রজাতির সাপ, ৪ প্রজাতির কচ্ছপ, ১ প্রজাতির কুমীর এবং ১১ প্রজাতির তিমি/ডলফিন রেকর্ড করা হয়েছে।

প্যারাবন (ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট)

সামুদ্রিক এবং স্থলভাগের মধ্যবর্তী অঞ্চল হিসাবে প্যারাবন হলো পৃথিবীর উষ্ণ মণ্ডলীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে লবণাক্ততা সহনীয় জোয়ার ভাটা অঞ্চল অরণ্যাঞ্চল সম্বলিত ইকোসিস্টেম। পৃথিবীতে প্রায় ১৭০,০০০ বর্গ কিলোমিটার অধ্যুষিত প্যারাবন রয়েছে। প্যারাবন সম্বলিত উপকূলীয় লেগুন (Lagoon) এবং মোহনা অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৮৩,০০০ বর্গকিলো মিটার। বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মিশ্র ও স্বাদু পানির মৎস্য প্রজাতির খাবার গ্রহণ, প্রজনন এবং পোনা প্রতিপালনের জন্য প্যারাবন হচ্ছে অত্যন্ত উপযোগী অঞ্চল। এমনকি বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি প্রাণীর পোনার প্রতিপালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে প্যারাবন অঞ্চলের গুরুত্ব রয়েছে।

খুলনা সুন্দরবন

সুন্দরবন নামে খ্যাত প্যারাবনের প্রধান বনাঞ্চল খুলনা জেলার ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত । প্রায় ৫,৭৭,০৪০ হেঃ এলাকা জুড়ে এই এলাকায় রয়েছে অগণিত নদী, শাখা নদী এবং খোনা (লেগুন)। ঘন ও গভীর অরণ্য অধ্যুষিত এই 'সুন্দরবন' মূলত জোয়ার-ভাটা অঞ্চল। প্রায় ১২০ প্রজাতির মৎস্য এবং ২৭০ প্রজাতির পাখী এই সুন্দরবনকে সমৃদ্ধ করেছে। বৎসরের বিভিন্ন মওসুমে আগত বিভিন্ন ধরনের অতিথি পাখীর জন্য এই এলাকা বিখ্যাত। দূর দুরান্ত থেকে জেলেরা এসে এই এলাকায় অস্থায়ী নিবাস স্থাপন করে। আনুমানিক ১,৬০,০০ জেলে এই এলাকায় মৎস্য শিকারে নিয়োজিত রয়েছে।

চকোরিয়া সুন্দরবন

আরেকটি বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক প্যারাবন অঞ্চল হলো শত বছরের পুরাতন চকোরিয়া সুন্দরবন, যা কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলায় অবস্থিত । পরিতাপের বিষয় এই প্যারাবনের অধিকাংশই উপকূলীয় চিংড়ি খামারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বিগত ডিসেম্বর ১৯০৩ সনে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক চকোরিয়া সুন্দরবনের ২১,০২০.৪৫ একর প্যারাবন হিসাবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত, যার মধ্যে ১৮,৫০০ একর সংরক্ষিত বন এবং বাকী ২,৫২০.৪৫ একর সীমাবদ্ধ বন। বিগত ১৯৭৭ ইং থেকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত আরও

প্রায় ১৪,৮৪৪.৮৪ একর চিংড়ি খামারের জন্য লীজ দেওয়া হয়। ডক এলাকায় পরিবেশ সহায়ক চিংড়ি চাষের দিকে আরো মনোযোগ বৃদ্ধি করা দরকার।

মৎস্য সম্পদ

সামুদ্রিক মৎস্য বিশেষতঃ চিংড়ি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। যেখানে সুদুর অতীত থেকে উপকূলীয় জেলেরা সনাতনী মৎস্য শিকারকে তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন হিসাবে ধরে রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অযান্ত্রিক নৌযানের মাধ্যমে মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক নৌযানের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

বর্তমানে ট্রলার এবং যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের পরিবর্তে ধৃত মাছের মধ্যে ইলিশ, লইট্টা, ভেটকি, কোরাল, ছুরি, কামিলা, ফাইস্যা, লাখ্যা, হোন্দ্রা, রুপচান্দা, রাংগাচউখ্যা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আহরিত চিংড়ি সম্পদের মধ্যে বাগদা, হরিণা এবং গলদা চিংড়ির বাণিজ্যিক এবং রফতানী মূল্য বেশী। অন্যান্য সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদের মধ্যে রয়েছে কাঁকড়া, স্কুইড, লবষ্টার, কাটল ফিশ, ঝিনুক, সামুদ্রিক উদ্ভিদ (Sea-weed) ইত্যাদি। কক্সবাজার, মহেশখালী, টেকনাফ এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপে প্রায় ৭ প্রজাতির ভক্ষণীয় ঝিনুক (Oyster ও Mussel) পাওয়া গেছে। এই সব অঞ্চলে মানুষের খাবার হিসাবে সমাদৃত কিং কাঁকড়া (*Scylla serrata*) এবং ৫ প্রজাতির লবষ্টার ইতোমধ্যে আহরিত হচ্ছে ।

প্রবাল প্রাচীর

সেন্ট মার্টিন দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এর আয়তন প্রায় ৭.৫ বর্গ কিলোমিটার। অদ্যাবধি ৪ প্রজাতিসহ মোট ১৪ ধরনের প্রবাল প্রজাতি সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পাওয়া গেছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে অগণিত অতিথি পাখির আনাগোনা দেখা যায় এখানে। পাশাপাশি রয়েছে সামুদ্রিক কচ্ছপ, লবষ্টার এবং বিভিন্ন ধরনের বাহারী মাছ (Aquarium fish)। স্থানীয় অধিবাসীরা এই প্রবাল প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ তুলে নিয়ে পর্যটকদের নিকট বিক্রয় করে। এর পাশাপাশি কৃষিকাজ, মৎস্য শিকার এবং পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ডের কারনে এই প্রবাল দ্বীপের অংগহানি অব্যাহত রয়েছে।

সামুদ্রিক উদ্ভিদ

সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পাথুরে এলাকা এবং বালুময় সৈকত সামুদ্রিক উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য খুবই উপযোগী। সর্বোপরি এই অঞ্চলের পরিবেশ সামুদ্রিক উদ্ভিদ বেঁচে থাকাও বিস্তারের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। অদ্যাবধি ১৬৫ প্রজাতির সামুদ্রিক উদ্ভিদ সেন্ট মার্টিনে রেকর্ড করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ১৫০০ মেঃ টনের মতো অনাহরিত লাল সামুদ্রিক উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের মধ্যে ধারণকৃত জৈব-রাসায়নিক উপাদান সমূহ মানুষের খাবার হিসাবে অত্যন্ত সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এই উদ্ভিদ খেতে অভ্যস্ত নয় বলে এই বিশাল সম্পদ অনাহরিত রয়ে গেছে। এ সকল উদ্ভিদ মানুষের খাবার ছাড়াও অনেক প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানো সম্ভব।

আহরণ ও ব্যবস্থাপনা

দেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মধ্যে তলদেশীয় মাছ (Demersal Fish) এবং চিংড়ি সম্পদের উপর ব্যাপক জরিপ ও গবেষণা হয়েছে। সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য জরিপ সম্পদিত হয় ১৯৮৪-৮৭ সনে। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের গড়ের ভিত্তিতে তলদেশীয় মাছের মজুদ দাঁড়ায় ১,৫৬,০০০ মেঃ টন এবং সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য ফলন হচ্ছে ৪৭,৫০০-৮৮,৫০০ মেঃ টন। একইভাবে চিংড়ির মজুদ ৩৫০০ মেঃ টন এবং সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে আহরণযোগ্য পরিমান ৭০০০-৮০০০ মেঃ টন।

তবে উপরিস্তরের মাছ (Pelagic) এবং পূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের মজুদ নির্ণয়ের ব্যাপারে ইতোপূর্বে কোন জরিপ পরিচালিত হয়নি। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার তথা সুষ্ঠু আহরণের স্বার্থে এইসব মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয়ের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্চনীয়। এছাড়া সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণের স্বার্থে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। প্রাকৃতিক চিংড়ি পোনা আহরণের ব্যাপারে যে বিধি-নিষেধ ইতোমধ্যে জারী হয়েছে তার যথার্থ বাস্তবায়ন আবশ্যক। যে সমস্ত জাল ইতোমধ্যে ক্ষতিকারক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলির অপসারণ এবং ব্যবহার একেবারে বন্ধ করার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলভাগ জৈব ও অজৈব সম্পদের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। ইতোমধ্যে জৈব সম্পদের মধ্যে তলদেশীয় মাছ ও চিংড়ি সম্পদের জরিপ কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক পর্যায়ে এই সম্পদ আহরিত হচ্ছে। উপরিস্তরের মাছ এবং অন্যান্য অপ্রচলিত জৈব সম্পদ যেমনঃ কাঁকড়া, ঝিনুক, লবষ্টার, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ইত্যাদির মজুদ নিরূপণ করতঃ তা সহনশীল পর্যায়ে আহরণের মাত্রা নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ইকোসিস্টেম এবং জীব-বৈচিত্র্যের প্রতি ক্ষতিকারক এবং হুমকি সৃষ্টিকারী সব ধরনের অপতৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে এবং সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে কার্যকর ও ফলপ্রসু ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত জরুরী। মৎস্য সম্পদ নবায়নযোগ্য। অতি আহরণ যেমন ক্ষতিকর, অপরদিকে সম্পদ অনাহরিত থাকাও কাম্য হতে পারেনা।

নালী বিলের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনাভিত্তিক একটি উদ্যোগ

(Restoration and Sustainable Management of Fish Resources of Nali Beel at Kapasia: A Participatory Ecosystem Approach)

আইনুন নিশাত, মঞ্জুরুল হান্নান খান ও আব্দুর রব মোল্লা
আই.ইউ.সি.এন. বাংলাদেশ

Abstract

Bangladesh is a country boosting a number of both seasonal and perennial wetlands, which get interconnected, at least during the monsoon, adding tremendous value through augmenting habitat quality, abundance of aquatic biodiversity and eventually ensuring livelihood security of the wetland people. Untill recent past, Nali beel of Kapasia Upazilla under Gazipur district was widely connected with the water bodies of Brahmaputra-Shitalakshya river floodplains through its several connectivity's which are now almost lost due to unabated encroachment and situation. Out of Nali's 400 ha area, 12 ha now has perennial characteristics; the beel is bounded by Mashak, Fulbaria, Palashpur, Durgapur and Kamra villages of Durgapur union. Both the seasonal and perennial parts of the beel provide extensive support to the people living around in terms of fisheries and agriculture, However agrarian activities in the lower and upper edges of the beel have been gradually and extensively taking over the wetlands, reducing the potential size of Nali beel everyday. Understanding the above trends of resource depletion, people residing in the peripheries of Nali beel took an initiative in 2001, under the banner of 'Community Based Floodplain Resource Management' component of 'Sustainable Environment Management Programme' (SEMP) to improve the situation. To start with, a fisheries survey was conducted in the Nali beel which identified a total of 79 fish species including 38 rare species. Over the last 2 decades, 4 species of fish have become very rare in Nali, namely Baro chela *(Salmostoma bacila)*, Paul chela *(Salmostoma phulo)*, Rani *(Botia lohachata)* and Meni *(Nandus nandus)*. The initiated community based approach emphasized on the restoration of aquatic biodiversity, mainly fish and its habitats involving the multi-stakeholders in all stages of project implementation. The experts on natural resource management provided input to strengthen the methods that often benefited from the principles and operational guidance of the ecosystem approach of Commission on Ecosystem Management (CEM) of IUCN – The World Conservation Union. The participatory ecosystem approach integrated rights of resource users and conservation and sustainable management of land, water and living resources. People's efforts in managing Nali helped restore the fisheries resources as well as ecosystem for sustainable development of both human and ecosystem to a considerable extent.

ভূমিকা

তিন প্রধান নদ-নদী–পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের অগণিত শাখা-প্রশাখা বিধৌত বদ্বীপ এই বাংলাদেশ। এ ছাড়াও দেশে আছে আরো অনেক ছোটবড় নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হ্রদ, মৌসুমী প্লাবনভূমি যা বর্ষাকালে স্বাভাবিকভাবে দেশের এক-চতুর্থাংশের বেশি এলাকাকে নিমজ্জিত রাখে। বিস্তৃত এই জলাধারগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস এবং দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর ওপর নির্ভরশীল। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ এবং জলাভূমির সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহারে এর প্রতিবেশ এবং

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে, এর ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দিন দিন প্রকটতর হচ্ছে।

নিকট অতীতে শীতলক্ষ্যা নদীর প্লাবনভূমিতে অবস্থিত নালী বিল মৎস্যসম্পদের এক নিবিড় আধার হিসেবে পরিগণিত হত। এই বিল সমগ্র কাপাসিয়া এলাকার জনগোষ্ঠীর আয়ের অন্যতম উৎস, যা কৃষি ও মৎস্যসম্পদ ছাড়াও অন্যান্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছিল। কিন্তু অপরিকল্পিত কৃষি সম্প্রসারণ ও জলাভূমি বেহাত হওয়ার ফলে নালী বিল ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়। নালী বিলকে অন্যান্য জলাশয় ও নদীর সাথে সংযোগকারী বিভিন্ন খালগুলি ভরাট হওয়ায়, এ বিলটি বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় বিচ্ছিন্ন থাকে। বর্তমানে নালী বিল শুধুমাত্র বর্ষাকালে শীতলক্ষ্যা নদীর সাথে সংযুক্ত থাকে। প্রায় ৪০০ হেক্টরের নালী বিলের মাত্র ১২ হেক্টর জমিতে বর্তমানে সারা বছর পানি থাকে। বর্তমানে এটাই মৎস্য সম্পদের একমাত্র আবাসস্থল।

সম্প্রতি নালী বিলকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এলাকার জনগোষ্ঠী ঐ জলাভূমির সম্পদ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা ২০০১ সালে জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্লাবনভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অর্ন্তভূক্ত। এর বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে আই.ইউ.সি.এন. বাংলাদেশ ও এ কাজে মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতা করছে নেচার কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট (নেকম) নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

নালীবিল ও জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্র্যের আবাস হিসেবে নালী বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগোষ্ঠীভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষায় জানা যায় যে, এ বিলটিতে অন্ততঃ ৭৮ প্রজাতির মাছ, ৮ প্রজাতির ব্যাঙ, ৩১ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮৩ প্রজাতির পাখি এবং ১১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। ক্রমবর্ধমান আবাস সঙ্কোচন এবং জলাভূমির আন্তঃসংযোগ বিনষ্টের ফলে জীববৈচিত্র্যের বংশবৃদ্ধি, পুনর্বাসন এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিগত দুই দশকে নালী বিল থেকে অন্ততঃ চার প্রজাতির মাছ যথা বড় চেলা, পল চেলা, রাণী এবং মেনী মাছ প্রায় হারিয়ে গেছে। নালীবিলের মৎস্যসম্পদ হ্রাস পাওয়ার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং দারিদ্র্য বাড়ছে যা টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

নালীবিল সম্পদ ব্যবস্থাপনা

নালীবিল সম্পদ পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে আই.ইউ.সি.এন. ও নেকমের মাধ্যমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় নালী বিলের চারদিকে অবস্থিত ৫টি গ্রাম যথা- মাসক, ফুলবাড়িয়া, পলাশপুর, দুর্গাপুর ও কামরাকে সম্পৃক্ত করা হয়। গ্রামগুলির জনসাধারণ, যাদের বিলের সম্পদের ওপর অংশীদারিত্ব রয়েছে তাদের এ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের মাধ্যমে কার্যক্রমের পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে সেটা বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিলের ভরাট অংশ পুনরুদ্ধার, বিলে হারিয়ে যাওয়া মাছ নতুন করে ছাড়া, মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি এবং সর্বোপরি এলাকার সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে নালী বিল সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করা। নালী বিল সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ তরান্বিত করার জন্য আয়োজন করা হয় সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান (লোক নাটক, উঠান বৈঠক, স্কুল বৈঠক ইত্যাদি) ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের। পূর্বে উল্লিখিত পাচটি গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্রামভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয় । এই কমিটিগুলিই বর্তমানে গ্রাম তথা নালী বিলের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ, বিশেষ করে মাছ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

জলাভূমির সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য সকল গ্রাম কমিটির প্রতিনিধিদের সমবায়ে নালী বিল সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে নালী বিল ব্যবস্থাপনার সাথে স্থানীয় সরকার ও তার উন্নয়ন কার্যক্রমকে একত্রীভূত করা সহজ হয়েছে।

গৃহীত কার্যক্রম

নালী বিলের প্রতিবেশ ও তার জীববৈচিত্র্য তথা মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ সেই এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব ও বিলের টেকসই উন্নয়নকে মাথায় রেখেই প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Ecosystem Approach) বিবেচনা করা হয়। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আই.ইউ.সি.এন.- দ্য ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়নের প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা কমিশন (Commission on Ecosystem Management) সুপারিশকৃত ১২টি নীতিমালার আলোকে সমগ্র সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সমন্বয় বিধান করা হয়, যা সমাজের পছন্দ-অপছন্দ, অর্থনৈতিক সুফল, সমবন্টন ও মাটি-পানি ও জীবসম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। সকল কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর

অংশগ্রহণে সম্পদে তাদের অধিকার ও তার থেকে সুফল লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করে। নালী বিল সংরক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

মৎস্য অভয়াশ্রম

নালী বিলের হারিয়ে যাওয়া মৎস্যসম্পদ ও বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিলের জমির মালিকদের পক্ষ থেকে নালী বিল সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে তিনটি প্লট (প্রতিটি ১০ শতাংশ করে) দান করা হয়। এই প্লট গুলিকে সারা বছর পানি ধরে রাখার উপযোগী করার জন্য প্লাবনভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় খনন করে তাতে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত আছে সংশ্লিষ্ট বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি। এলাকাবাসীর মতে, এই অভয়াশ্রম হারিয়ে যাওয়া মৎস্য সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং তাদের শুকনো মৌসুমে থাকার জায়গা নিশ্চিত করবে, মাছের প্রজনন নিশ্চিত হবে, মা ও ডিমওয়ালা মাছ রক্ষা পাবে এবং মাছের সমন্বিত ও সামগ্রিক বৃদ্ধির মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থান হবে ও আমিষের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

হারিয়ে যাওয়া স্থানীয় মাছ অবমুক্তকরণ

অপরিকল্পিত ও অতিরিক্ত মাছ আহরণের ফলে নালী বিলের মৎস্যসম্পদ ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নালী বিলের মৎস্য সংরক্ষণের উপায় হিসেবে এলাকাবাসীর সাহায্যে হারিয়ে যাওয়া মাছ বিলে নতুনভাবে অবমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অবমুক্ত জাতের মধ্যে আছে পাবদা, মেনি ও দেশী জাতের সরপুঁটি। এলাকার মৎস্যজীবীদের মতে, নালী বিলে এখন অবমুক্ত মাছের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাছে, যা অদূর ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত পরিমাণে দাড়াবে বলে তারা মনে করছে।

মৎস্য আহরণে বিরতি

মৎস্যসম্পদের পরিমাণ ও প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য নালী বিল সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে বর্ষার শুরু থেকে চার মাস (জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র) মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার ফলে এই বিলে মাছ বহুলাংশে বেড়েছে এবং বর্ষা মৌসুমের শেষ দিকে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছ বড় হওয়ার পর বিলের পারে বসতকারী সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা সবাই মাছ ধরতে পারে। ঐ ৪ মাস মাছ ধরা থেকে বিরত থাকার ফলে এলাকার পেশাদার ও অপেশাদার সকল মৎস্যজীবীরা বেশি মাছ পাচ্ছে। ফলে, তাদের জীবন-জীবিকার ক্রমশঃ মানোন্নয়ন ঘটছে এবং নালী বিল সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে তারা কার্যকরভাবে সমর্থন করছে।

বিকল্প কর্মসংস্থান

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে আই.ইউ.সি.এন. ও নেকমের যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত করা হয় এবং গ্রাম সংগঠনগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সদস্যদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

কার্যক্রমের আওতায় নালী বিলের চতুর্পাশের পাঁচটি গ্রামে ৫টি সংগঠন তৈরি করা হয়, যার অধিকাংশে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। দল গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন আয়মূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং পরে দলের সদস্য/সদস্যদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। এই অনুদান "পরিবেশ তহবিল" নামে পরিচিত। দলীয় এই তহবিল ব্যবহার করে সদস্য/সদস্যরা ব্যক্তিগত বা দলীয় পর্যায়ে হাঁস-মুরগির খামার, গো-পালন, হস্তশিল্প কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করছে, বাড়তি আয় করছে এবং ফলে ধীরে ধীরে নালী বিলের সম্পদের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা কমে আসছে।

উপসংহার

প্লাবনভূমি মাছের বিচরণ ও বংশবিস্তারের প্রধান ক্ষেত্র-নালী বিল তার ব্যতিক্রম নয়। শুধুমাত্র অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন, জলাভূমি বেদখল ও কৃষি সম্প্রসারণের ফলে মাছের আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে এবং জলাভূমির প্রতিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। নালী বিলে সফলভাবে বাস্তবায়িত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন ও হারিয়ে যাওয়া মৎস্য প্রজাতি পুনরুদ্ধার পদ্ধতি বাংলাদেশের সকল উন্মুক্ত জলাশয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেখানে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে ।

জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের বিনষ্ট প্লাবনভূমিগুলিকে পুনরুদ্ধার করা গেলে একদিকে যেমন আরো বেশি ও বিচিত্র প্রজাতির মাছ পাওয়া যাবে, অন্যদিকে তেমনি সম্পদের সমবন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য কমানো সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের রুই-কাতলার একমাত্র প্রজনন ভূমি হালদা নদী: সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

(The Halda river, only Breeding Ground of Major Carps in Bangladesh Conservation and Management)

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Bangladesh is the riverine country in the world, is situated in the largest deltaic river the Ganga, the Brahmaputra and the river Meghna. These rivers are blessed with diverse fisheries resources which are depleted due to manmade and nature made hazards. To ensure the fish availability in the country not only restoration of spawning ground is essential but also creation of facilities for free movement of the fish in the ground is important . since liberation, no attention was given to this sector. In order to find out the problems and its solutions, a long term research programme is to be undertaken.

From the time immemorial fishermen collect fertilized eggs of major carps from the river Halda. In 1945, spawn production of major carps was 2,500kg which declined to 200kg in 2003. Due to habitat degradation, destruction of grazing, spawning and nursery grounds blockade of migration routs due to construction of sluice gate discharging untested effluents and wastes from industries and municipal areas are the causative reasons of declining spawn in the Halder river. Based on this paper suggestions are made to improve spawning success of major carps in the river Halda. A fish sanctuary should be established.

ভূমিকা

বিশ্বের অন্যতম বড় নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার ডেলটায় অবস্থিত হাজারো নদ-নদীর দেশ বাংলাদেশ। নদীসমূহ বৈচিত্র্যময় মৎস্যসম্পদে ভরপুর। এত বৈচিত্র্যময় জলজ জীবগোষ্ঠী (Bio-diversity) বিশ্বের আর কোন ছোট দেশে দেখা যায় না। বাংলার ঘরে ঘরে একসময় মাছ ধরার উৎসব চলত। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাপ, অতি আহরণ, পানি দূষণ, পলিজনিত খালভরাট, নদীর বাঁক কর্তন, মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রের ধ্বংস সাধন, ক্ষতিকারক জাল দিয়ে মৎস্য আহরণ, সারাবছর মাছ আহরণ, অপরিকল্পিত বাঁধ ও স্লুইস গেইট নির্মান সহ মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে আজ প্রাকৃতিক মৎস্য ভান্ডার ধ্বংসের মুখে। সারা দেশে পর্যাপ্ত মাছ প্রাপ্তি নিশ্চয়তার জন্য নদীসমূহের মাছের প্রজনন ভূমি সংরক্ষণ যেমন অপরিহার্য অন্যদিকে প্রজনন মৌসুমে মাছের অবাধ বিচরণসহ মাছের প্রজননের নিশ্চয়তা প্রদানও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত প্রায় তিন-দশক ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটির প্রতি আমাদের নজর মোটেও নেই। তার অন্যতম প্রমাণ বাংলার গৌরব মেজর কার্প তথা রুই-কাতলার একমাত্র প্রজনন ভূমি হালদা নদীর আজ জীর্ণদশা। বাংলাদেশের রুই-কাতলার একমাত্র প্রজনন ভূমি হালদা নদীকে বাঁচিয়ে রাখা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জন্য অতীব প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মাথায় রেখে হালদা নদী ও হালদার রুই-কাতলার প্রজনন নিয়ে বিগত ১৯৭৭ খৃস্টাব্দ থেকে গবেষণা করা হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হালদা নদীতে রুই-কাতলার প্রজনন সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা কার্যক্রম।

হালদা নদীর বিশেষত্ব

- চট্টগ্রামের হালদা নদী শুধু বাংলাদেশের নয় ইহা বিশ্বের একমাত্র জোয়ার ভাটা প্রভাবিত নদী যেখান থেকে প্রাকৃতিকভাবে প্রজননকৃত রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালিবাউশের ডিম আহরণ করা হয়। বিশ্বের আর কোন নদী থেকে ডিম আহরণের নজির নেই।
- আহরণকৃত ডিম স্মরণাতীত কাল থেকে স্থানীয় জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাচীন পদ্ধতিতে নদীরপাড়ে খননকৃত মাটির কুয়ায় ফোটানো হয় এবং চারদিন লালন করে রেণু তৈয়ার করা হয়। ময়মনসিংহ শহরের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এবং রাজশাহী অঞ্চলের কিছু নদীর

ভাটিতে শুধু রুই-কাতলার পোনা আহরণ করা হয়। প্রজনন কেন্দ্র ঐ সমস্ত নদীর উজানে ভারতে অবস্থিত।

- জোয়ার-ভাটার (টাইডাল) নদী হিসাবে হালদা একমাত্র নদী যেখানে বর্ষাকালে (এপ্রিল-জুন) রুই-কাতলা ডিম ছাড়ে। টাইডাল নদীতে ডিম ছাড়ার নজির একমাত্র হালদাতেই। ভারত তথা পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য জায়গায় যেমন বন্যা প্লাবিত নালা পরিখা এবং ধানী জমি (খান ১৯২৪, ডুবে এবং টুলি ১৯৬১), স্বল্প গভীর পানির এলাকা (মুখার্জী ১৯৪৫), আন্তসংযুক্ত চ্যানেল পদ্ধতি (ডেভিড ১৯৫৯), টাইডাল আবেশ ছাড়া প্রবাহিত নদী (জব এবং চেকো ১৯৪৮) ইত্যাদিতে রুই-কাতলা ডিম পাড়ার নজির আছে।
- ষাট এবং সত্তর এর দশক পর্যন্ত সারা দেশের ২/৩ অংশ পুকুরে মৎস্য চাষ তথা একোয়াকালচার হালদার পোনা দিয়েই করা হতো। ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া পিরিয়ডে ভারতে এবং বার্মায়ও হালদার পোনা নিয়ে যাওয়া হতো। বর্তমানেও জাতীয় অর্থনীতিতে হালদার গুরুত্ব ব্যাপক।
- আশির দশক থেকে দেশে ব্যাপক আকারে মাছের কৃত্রিম প্রজনন শুরু হলে সারা দেশে কৃত্রিম প্রজননের পোনার চাহিদা বাড়তে থাকে। কিন্তু কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে ইনব্রিডিং এর কারণে অধুনা মাছের গ্রোথ তথা বৃদ্ধি ব্যাহত এবং বিভিন্ন ধরণের বিকলাঙ্গ সমস্যা দেখা দিলে মৎস্য চাষি এবং হ্যাচারি মালিকেরা আবার হালদার পোনার দিকে ঝুকে পড়ে।
- তাই রুই-কাতলার প্রকৃত জিন-পুল বাঁচিয়ে রাখার জন্য হালদা নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। হালদা হলো রুই, কাতলা, মৃগেল, এবং কালিবাউশের প্রাকৃতিক জিন ব্যাংক। জাতীয় অর্থনীতিতে টাকার অংকে এর পরিমাপ সম্ভব নয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক উৎসের মেজর কার্পের (বাইরে ইন্ডিয়ান কার্প হিসেবে পরিচিত) জন্মস্থান হালদা। ফিশ ইনডিউসড হ্যাচারি তথা বাংলাদেশের একোয়াকালচার এবং বায়োডাইভারসিটি বাচিয়ে রাখার জন্য হালদার প্রাকৃতিক উৎসের মেজর কার্পের পোনা তথা বীজের গুরুত্ব তুলনা বিহীন।

হালদা নদীতে রুই-কাতলার পোনা উৎপাদনের ইতিহাস

হালদা নদীতে স্মরণাতীত কাল থেকে রুই-কাতলা জাতীয় মাছের ডিম আহরিত হয়ে আসছে। নিম্নে লেখচিত্রে ১৯৪৫-২০০৩ পর্যন্ত আহরিত ডিম থেকে পোনা উৎপাদন দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পোনা উৎপাদিত হয়েছে ৪১১১ কেজি ১৯৪৬ সালে এবং সবচেয়ে কম উৎপাদিত হয়েছে ২১৭ কেজি ২০০৩ সালে (Fig.1)। পোনা উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে গেছে। ২০০৪ সালে ২/৩ বার নমুনা দিয়েছে। লার্জ স্কেলে কোন ডিম ছাড়েনি। ৮০০-১০০০ ডিম আহরণকারী জেলেদের থেকে মাত্র ১০/১২ জন জেলে নমুনা সংগ্রহ করে শুধু মনুনাঘাট সরকারি হ্যাচারির ৯টি জায়গায় (২টি সারকুলার ট্যাংক, ৩টি টাইলস সিসটার্ন, ৪টি সিমেন্ট সিসটার্ন) ডিম ফোটায়ে মাত্র এক থেকে সোয়া কেজি রেণু উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে আমার প্লাষ্টিক ট্যাংক ও টাইলস সিসটার্নে যথাক্রমে ৮০ ও ৪০০ গ্রাম রেণু উৎপাদিত হয়েছে (ডিমের পরিমাণ কম হওয়াতে উৎপাদন কম হয়েছে)। চলতি বছর ২০০৫ সালে ১৩ এপ্রিল একবার নমুনা আকারে এবং বেশী পরিমাণে ২১ এবং ২২ মে লার্জ স্কেলে ডিম দিয়েছে। ১৩ এপ্রিল ২০০৫ খুব অল্প সংখ্যক লোক ডিম ধরতে পেরেছে। রেণু উৎপাদিত হয়েছে ১০-১২ কেজি। তবে ২১/২২ মে ২০০৫ প্রায় ৩০০/৪০০ নৌকা থেকে প্রায় ১৫০ নৌকা ডিম পেয়েছে। সরেজমিন তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে রেণু উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ কেজির বেশী নয়। তবে আশার কথা হলো ২০০৮ এর তুলনায়

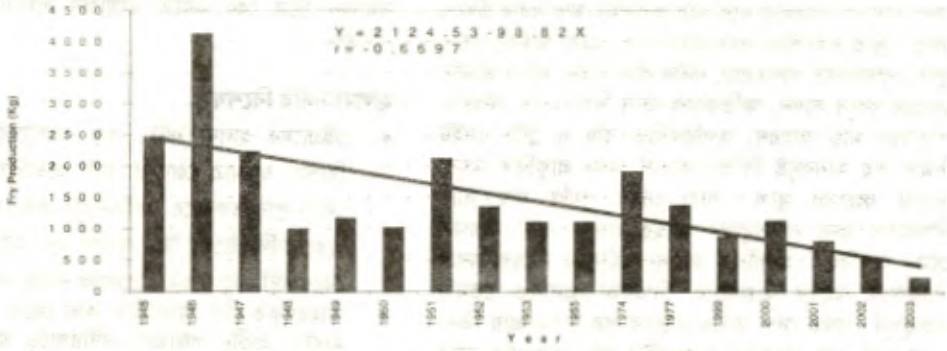

Fig. 1. Historical major carps fry production trend in the River Halda.

২০০৫ এ ডিম বেশি পাওয়া গেছে।

উৎপাদিত চারদিন বয়সী পোনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দামে বিক্রয় হয়েছে । পোনার দাম নির্ভর করে পোনা উৎপাদনের পরিমাণ এবং চাহিদার ওপর। ১৯৭৮ সাল থেকে দেখা যায় প্রতি কেজি পোনার দাম ৫০০০/-টাকা থেকে ২৮,০০০/- টাকায় উঠানামা করেছে। ১৯৭৮ সালে অস্বাভাবিক বন্যার কারণে নদীর দুইকূলের কুয়াতে ফোটানো প্রচুর পরিমাণ পোনা নদীর পানিতে চলে যায় ফলে প্রতি কেজি পোনার দাম ২০,০০০/- টাকা থেকে ২৮,০০০/- টাকায় বিক্রয় হয়। ১৯৭৪ সালে প্রতি কেজি পোনার দাম ছিল ৭০০/--১২০০/- টাকা, ১৯৭৭ সালে ৫০০০/- ৮০০০/- টাকা। ২০০২ ও ২০০৩ সালে ৬০০০/-১২০০০/-টাকা। ২০০৪ সালে অতি সামান্য পোনা উৎপাদিত হয় (সোয়া ১ কেজি মাত্র) যা কেজি প্রতি ২৫০০০/-থেকে ২৮০০০/- টাকা দরে বিক্রয় হয়। চলতি বছর ২০০৫ সালে ২৬০০০/- থেকে ২৮০০০/- টাকা দরে বিক্রয় হয়।

হালদায় উৎপাদিত পোনা দেশীয় অর্থনীতিতে ৩ বার [(১ম বার রেণু হিসেবে, ২য় বার আঙ্গুলি পোনা হিসেবে, ৩য় বার মজুদ পুকুর থেকে উৎপাদিত মাছ হিসেবে)] অবদান রাখে, (নিচের টেবিলে তা দেখানো হল)। তাছাড়া কিছু সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারিতে হালদার পোনা দিয়ে ব্রুড ফিশ (মাতৃ মাছ) তৈরী করে পোনা উৎপাদনে ব্যবহার করে দেশের একোয়াকালচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সাল	উৎপাদিত রেণু পোনার পরিমাণ (কেজি)	রেণু পোনার দাম (কেজি-প্রতি ১০,০০০/-টাকা হলে) ১ম দফায় আয়	উৎপাদিত রেণু পোনা থেকে পুনঃ উৎপাদিত প্রতি ৩-৪" আঙ্গলি পোনা (বাচার হার ৬০% ধরে) ১ টাকা হিসেবে ২য় দফায় আয়	আঙ্গুলি পোনা মজুদ পুকুরে ১ বছরে মাছ হিসেবে, (বাচার হার ৬০% ধরে) এবং প্রতি কেজি মাছের দাম ১০০/- টাকা হিসেবে ৩য় দফায় আয়
১৯৪৬	৪১১১ কেজি	৪,১১,১০,০০০/-* (৪ কোটি ১১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা)	৩২,৫৫,৯১,২০০/-* (৩২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৯১ হাজার ২০০ টাকা)	১৯৫৩,৫৪,৭২,০০০/-* (১৯৫৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা)
২০০২	৫১৪ কেজি	৫১,৪০,০০০/- (একান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা)	৬,৭৮,৪৮,০০০/- (৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা)	২৪৪,২৫,২৮,০০০/- ২৪৪ কোটি ২৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা

*বর্তমান বাজার দামে।

হালদার একটি ডিমওয়ালা ৫ কেজি ওজনের কাতলা-রুই মাছ থেকে যে রেণু হয় (প্রায় ১০লক্ষ) তার দাম দাড়ায় ৪৫,৪৫৪/- টাকা। ১০ লক্ষ রেণু, ধানী পোনা করে (বাঁচার হার ৬০% ধরে) বিক্রয় করলে দাম দাড়ায় ৬,০০,০০০/- টাকা এবং ধানী পোনা মজুত পুকুরে এক বছর রেখে (বাচার হার ৬০% ধরে) বড় মাছ করে কেজি প্রতি ১০০/- করে বিক্রয় করলে আয় হবে ৩,৬০,০০০০০/- টাকা।

অর্থাৎ হালদার একটি ৫ কেজি ওজনের ডিমওয়ালা কাতলা মাছ সর্বমোট অবদান রাখতে পারে ৩,৬৬,৪৫,৪৫৪/- টাকা (৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৫৪ টাকা)।

হালদা নদীতে ২০০৪সালে রুই-কাতলা পর্যাপ্ত ডিম না ছাড়ার কারণ কি? এবং প্রতি বছর ডিম পাড়া কমে যাচ্ছে কেন?

১। ২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৭ ই জুন পর্যন্ত পূর্ণিমা-অমবস্যার সময় একটানা ১/২ দিন বৃষ্টি না হওয়ার ফলে পানির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ফ্যাক্টরগুলি সেট হতে পারেনি যা মাছকে ডিম ছাড়তে প্রভাবিত করে।

২। ২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৭ ই জুন একটানা প্রায় ৩ মাসের মত অতিরিক্ত গরমের ফলে মাছের জনন কোষ বা গোনাডাল ডেভেলপমেন্ট সাইকেল ব্যাহত হয়েছে। ফলে বেশ কিছু রুই-কাতলা মাছ মারাও গেছে যা মার্দাশার বড়ুয়ার টেকের এবং অন্যান্য জায়গার অনেক লোকজন প্রত্যক্ষ করেছে।

৩। ২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৭ ই জুন একটানা প্রায় ৩ মাসের দীর্ঘ সময় হালদায় ডিম ছাড়তে আসা অপেক্ষমান অনেক ডিমওয়ালা মাছের অধিকাংশ অসাধু মৎস্য শিকারীরা ধরেও ফেলেছে।

৪। ডিমওয়ালা কিছু মাছ হালদার রেসিডেন্ট, বাকীগুলো সাঙ্গু, চাঁদখালী থেকে শিকলবহা নদী হয়ে কর্ণফুলী দিয়ে হালদায় আসে। কিছু মাছ কর্ণফুলীর রেসিডেন্ট ও আছে। সাঙ্গু চাঁদখালী ও কর্ণফুলী থেকে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে মাইগ্রেশন করে ডিম পাড়ার জন্য হালদায় আসার সময় অসাধু মৎস্য শিকারীরা জাল পেতে প্রতিবছর অনেক মাছ ধরে ফেলে।

৫। এ যাবত (১৯৪৮ থেকে) নদীর ৪টি বাঁক (Oxbow-bend) কেটে ফেলা হয়েছে। এ বাঁকগুলিই মূলত: মাছের প্রজনন ভূমি (চিত্র-২ দেখুন)। বাঁক কাটার

ফলে নদীর দূরত্ব কমে গেছে। ফলে পানির গতিবেগ বর্ষায় বন্যার সময় অতিরিক্ত বেড়ে যায় । এবং অতি অল্প সময়ে ডিম কর্ণফুলীতে চলে আসে এবং সাগরের পানিতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ২০০৪ সালে তাই ঘটেছে। অল্প পরিমাণ যে ডিম ধরা পড়েছে, তার বেশির ভাগই মদনা ঘাটের নীচের থেকে। অতীতে বেশির ভাগ ডিম ধরা পড়েছে কেরামতলীর বাগ থেকে রামদশা হাট পর্যন্ত। বাঁক কাটার ফলে নদীর দূরত্ব কমে গিয়ে নদীর ইকোসিস্টেমের ব্যাপক পরিবর্তন (Irreversible change) ঘটেছে এবং জীববৈচিত্র্য ও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। ফলে হালদায় আগের চেয়ে ডিম পাড়া অনেকাংশে কমে গেছে।

থেকে তৈরী ৫০০ টি ব্রুড (১০০ টি পুরুষ ও ৪০০টি স্ত্রী মাছ) মাছ হালদায় অবমুক্ত করা হলে, প্রাকৃতিক কারণে মাছগুলো প্রাকৃতিক ভাবেই প্রজনন করবে এবং হালদা নদী মাছের ডিমে সয়লাব হয়ে যাবে। ডিম আহরণকারীরা পর্যাপ্ত ডিম পাবে। সারা দেশের মৎস্যচাষিরা হালদার অতি শক্তিশালী দ্রুত বর্ধনশীল প্রাকৃতিক রুই-কাতলার পোনা দিয়ে মৎস্য চাষ করতে পারবে। হ্যাচারিগুলো ইনব্রিডিং এর হাত থেকে রক্ষা পাবে। হালদাতে কিছুতেই হ্যাচারির পোনা ছাড়া সমীচীন হবেনা।

চিরাচরিত নিয়মে ডিম ফোটাতে ও লালন পালনের সময় প্রায় ৫০% ডিম ও রেণু নষ্ট হয়। মদুনাঘাটে সরকারি হ্যাচারিতে হালদার ১০/১২ জন ডিম সংগ্রহকারী ডিম ফোটানোর সুযোগ পায়। অনুরুপ আরও ২টি হ্যাচারি হাটহাজারীর নয়াহাট ও নয়াহাটের বিপরীতে রাউজানে অচলভাবে আছে। সরকারি উদ্যোগে এ হ্যাচারি দু'টাকে সক্রিয় করতে হবে এবং আরও অন্তত ৫টি 'মদুনাঘাট মডেলের হ্যাচারি' নির্মাণ করা প্রয়োজন। যাতে আরো ৩০০/৪০০ জন ডিম সংগ্রহকারী ডিম ফোটাতে পারে। সেইসাথে ১০টি করে বহনযোগ্য প্লাষ্টিক ইনকুবেশন ট্যাংক হ্যাচারি (চিত্র সংযুক্ত দেখুন) বর্তমানে অবস্থিত ৩টি হ্যাচারীতে (১টি সচল, ২টি অচল) সরকারিভাবে প্রদান করলে আরো ৩০ জন ডিম সংগ্রহকারী তা ব্যবহার করতে পারবে। প্লাষ্টিক ইনকুবেশন ট্যাংক হ্যাচারিতে ডিম ফোটার এবং লালন পালনে বেঁচে থাকার হার ৯০% এর অধিক তাই পোনা উৎপাদন দ্বিগুন হবে। বহনযোগ্য বিধায় বন্যার অতি পানির সময় সুবিধাজনক স্থানে সরিয়ে নেয়া যাবে এবং পুকুরের পানিও ব্যবহার করা যাবে। পরীক্ষায় দেখা গেছে টাইলস সিসটার্নেও ডিম ফোটার হার ও লালন পালনের সময় বেঁচে থাকার হার ৯০% এর অধিক। তাই অধিক লোক ব্যবহার করে দ্বিগুণ পোনা উৎপাদনের জন্য ১০টি করে টাইলস সিসটার্ন ও উক্ত হ্যাচারি গুলোতে নির্মাণ করে দেয়া যেতে পারে। প্লাষ্টিক ইনকুবেশন ট্যাংক হ্যাচারি কার্যকারিতা দেখে পরবর্তীতে ডিম সংগ্রহকারীরা কম খরচে তা বানিয়ে ব্যবহার করবে। বর্তমানে মদুনাঘাট হ্যাচারিতে ২টি গাজী প্লাষ্টিক ট্যাংক ও ৩টি টাইলস সিসটার্ন ইনকুবেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

- হালদার আর কোন বাঁক (Oxbow-bend) কাটা যাবে না। বাঁক এলাকার লোকজনের ঘরবাড়ী নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারিভাবে পাথর ঢেলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। এতে স্থানীয় জনগণ উপকৃত হবে এবং দুঃসহ যন্ত্রনা ও মৃত্যু ঝুঁকি মাথায় নিয়ে রাত্রের অন্ধকারে চুরি করে Oxbow-bend কেটে দিয়ে তাদের ঘরবাড়ী রক্ষা করতে গিয়ে জাতীয় মূল্যবান সম্পদ রুই-কাতলার প্রজনন স্থান নষ্ট করবে না।
- হালদাকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করলে হালদার ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বিকল্প কর্ম হিসেবে হালদার উপখালগুলিতে মাছ চাষ পরিকল্পনায় তাদেরকে ও স্থানীয় বেকার যুবকদের সংযুক্ত করতে হবে।
- হালদাতে রুই-কাতলার প্রজনন টিকিয়ে রাখতে হলে ভবিষ্যতে যে কোন পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণে হালদার সাথে দীর্ঘদিনের সংশ্লিষ্ট গবেষকবৃন্দ এবং হালদার কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা একান্ত জরুরী তা হলে সমস্যার সঠিক সমাধান হবে এবং রুই-কাতলার প্রজনন ভূমি হালদাকে সংরক্ষণ যথাযথ ও ফলপ্রসূ হবে।

উপসংহার

হালদাকে মাছের অভয়ারণ্য (নিরাপদ আশ্রয়) ঘোষণা করা সময়ের দাবী। মাছ ও মাছের পরিবেশের সাথে বাংলাদেশের মানুষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা তথা Livelihood সম্পর্কিত। এ কথা আমাদের বুঝতে হবে। মাছের যেসমস্ত প্রজনন ক্ষেত্র তথা পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। পোনা মাছ ধরা, সারা বছর মাছ মারা, ক্ষতিকর জাল ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। এ সমস্ত পেশায় যারা জড়িত তাদের পুনর্বাসন করতে হবে। তাহলেই প্রকৃত জলাভূমি থাকবে, বাঁচবে মাছ, টিকে থাকবে মানুষ ও বাংলাদেশ।

মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা
(Role of Mass Media on the Development of Fisheries Resources)

শাইখ সিরাজ
পরিচালক, চ্যানেল আই

Abstract

Bangladesh water bodies were considered as treasures of Fishereis Resoureces. Due to increasing population explosion, draining of water bodies and creation of flood control dam cummulatively dwindled the fisheries resource. In order to mitigate protein requirement fish culture concept came into force, though initially mass people could not conveined about aquaculture. But in the begining of mass media "TV" took a leading role which motivated people for fish culture. Now it is an established fact that audio visual fish culture success stories in a media can play a vital role than the efforts of many institution. So it can be claimed that in comperatively less educated society/country, role of mass media of any sectoral development has no alternative.

মাছের জন্য আগে মানুষ পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলো প্রাকৃতিক জলাশয়ের ওপর। প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছই সারা বছর ধরা হতো। জেলে সম্প্রদায় ছিলো বিল, হাওর ও খাল থেকে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত। সেই মাছ বাজারে বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। প্রকৃতিকে ভাবা হতো অসীম সম্পদের ভাণ্ডার। মাছের প্রশ্নে 'ধরা' ব্যতীত আর কোন বিষয় মানুষের মাথায় কাজ করেনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপাদানের পাশাপাশি খাদ্যের প্রধানতম আমিষ হিসেবে মাছের চাহিদাও বাড়তে থাকলো। প্রাকৃতিক উৎসগুলো থেকে অতিরিক্ত আহরিত হতে থাকলো মাছ। একটি সময়ে এসে আমাদের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে মাছের সংকট দেখা দিতে শুরু করলো। আর তখন থেকেই কমবেশি তাগিদ আসলো মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির। পরিকল্পিতভাবে আমাদের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নীতি নির্ধারক ও গবেষক পর্যায়ে সিদ্ধান্তের আলোকেই কৃত্রিমভাবে মাছের বংশবৃদ্ধির নানা উপায় নিয়ে ভাবা হলো। তারা দেখলেন, শুধু মাছ ধরলে হবে না। মাছের 'চাষ' করতে হবে। '৭০ এর দশকেও মাছের ক্ষেত্রে 'চাষ' বিষয়টি একেবারেই নতুন একটি ধারণা ছিলো। কৃত্রিম উপায়ে মাছের বংশবৃদ্ধি ও চাষ সম্পর্কে সরকারি পর্যায় থেকেই মানুষকে পরিচিত করার উদ্যোগ নেয়া হলো। সত্যিকার অর্থেই এই উদ্যোগকে বেগবান করলো মিডিয়া। '৮০'র দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে যখন মাছ চাষের কথা বলা হতো, তখন দেশের সাধারণ মানুষ তা দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যেতেন। মাছের আবার চাষ কী ? তার আগ পর্যন্ত গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও কৃষকদের কাছে মাছ প্রাপ্তির একটি সাধারণ কৌশল জানা ছিলো। তা হচ্ছে, কৃষকের বাড়িতে বসতভিটা সংলগ্ন যে পুকুরটি ছিলো তার সঙ্গে সংযুক্ত একটি নালা চলে যেত আবাদী জমিতে। পুকুর থেকে ক্ষেতে সেচ দেয়ার জন্যই ছিলো ওই ব্যবস্থা। বর্ষাকালে নালা খুলে দেয়া হতো। চারদিক থেকে ভাসা মাছ নালা দিয়ে ঢুকে পড়লে নালার মুখ আটকে দেয়া হতো। তারপর পুকুরের ভেতর ডালপালা ফেলে মাছ সংরক্ষণ করা হতো। এটিই ছিলো মাছ প্রাপ্তির একটি আদি ব্যবস্থা। গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি আসলে পুকুরের ডালপালা তুলে জাল ফেলে মাছ তোলা হতো। গৃহস্থ পরিবারে নিজেদের পুকুরের মাছ দিয়ে আপ্যায়ন ছিলো অনেক মর্যাদার বিষয়। মাছ প্রাপ্তি ও লালন পালনের ক্ষেত্রে এর বাইরে কোনকিছুর সাথেই এদেশের মানুষের পরিচয় না থাকার কারণেই চাষ শব্দটিতে গ্রামের সাধারণ মানুষের একটু ধাক্কা লাগে।

সময়ের প্রয়োজনেই সরকারি মৎস্য বিভাগ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের বিষয়টিকে বেশ গুরুত্ব দিয়েই এগুতে থাকে। দেশের জেলা, থানা পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মিত হলো। একদিকে সম্প্রসারণের জন্য প্রশাসনিক নানা আয়োজন, অন্যদিকে জেলা পর্যায়ে হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শুরু হলো মাছের ডিম ফোটানো, রেণুপোনা ও পোনা উৎপাদনের কাজ। গ্রামের মানুষের কাছে গিয়েও তারা বোঝানোর চেষ্টা করলো মাছ চাষের বিষয়টি। কিন্তু মাছ খেতে হবে চাষ করে, এ বিষয়টিই যেন গ্রামের মানুষের কাছে ছিলো দারুণ এক দুঃসংবাদ। কেউ কেউ কিছুটা উদ্বুদ্ধ হলো, কিন্তু অনেকেই পুরাতনী প্রাকৃতিক পদ্ধতি ছেড়ে চাষ পদ্ধতির মধ্যে আসতে তেমন আগ্রহ দেখালো না।

বিষয়টি সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বেকার তরুণসহ সকল পেশাজীবীর মধ্যে সাড়া জাগতে শুরু করলো যখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে শুরু হলো উদ্বুদ্ধকরণ প্রচারণা। যদিও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে বেশ দুরূহ ছিলো। মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি ব্যক্তিগতভাবে সকল জনগোষ্ঠীকে কৃষির এই গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক উপখাতটি সম্পর্কে বোঝানোর জন্য নানাভাবেই অনুষ্ঠান সাজানোর পরিকল্পনা নিলাম। মাথায় আসলো, মাছ চাষের সাফল্য তুলে ধরতে হবে। তাহলে একজনের সাফল্য দেখে আরেকজন উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত দেশের কোন এলাকায় উল্লেখযোগ্য সফল মাছ চাষির কোন উদাহরণ তৈরি হয়নি। আর মাছ চাষকে কৃষি কাজ হিসেবে কেউ গ্রহণও করেনি। তার আগ পর্যন্ত কৃষি ছিলো দানাদার শস্য ও পাট উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উপখাতগুলোর প্রসার নিয়ে সরকারি পর্যায়ে নানা পরিকল্পনা নেয়া হলেও সাধারণ কৃষকরা মূল কৃষি ছেড়ে অন্যকোন বাণিজ্যিক উৎপাদনের ব্যাপারে মোটেও আস্থাবান ছিলেন না। মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমি সরকারি একটি পুস্তিকায় দেখেছিলাম দেশে ১৮ লক্ষ আবাদী-অনাবাদী পুকুর রয়েছে। যেগুলো জনগণের বসতভিটা সংলগ্ন। আমার মাথায় চিন্তা এলো, মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার মূল কাজটি শুরু করতে হবে এখান থেকেই। এই একটি পয়েন্ট ধরেই আমি মাছ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্য নিয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে বেশকিছু কার্যক্রম হাতে নিই। যার ফলশ্রুতিই ছিলো হাকীম আলীর মৎস্য খামার। সফল চাষি না পেয়ে রূপক এই চরিত্রটি তৈরি করেছিলাম, দেখিয়েছিলাম মাছ চাষের মাধ্যমে হাকীম আলীর উন্নতির নানা চিত্র। বসতভিটায় তার মাছ চাষ, মাছ বিক্রির লাভের টাকা গোনা, হাকীম আলীর বউয়ের ভাসা তেলে মাছের মুড়ো ভাজার সেই দৃশ্য আজো মানুষ মনে রেখেছে। আমার নিজের কাছেও মনে হয়েছে, সেটি ছিলো একটি অত্যন্ত কার্যকর একটি অধ্যায়। গ্রামের সাধারণ কৃষকরা স্বপ্ন দেখে ফেললেন হাকীম আলী হওয়ার। খুব শিগগিরই তার বৈপ্লবিক সাফল্যও চোখে দেখা গেল। গ্রামে গ্রামে যেসব পুকুর পরিত্যক্ত পড়ে থাকতে দেখতাম, তার বেশীরভাগেই শুরু হলো মাছের চাষ।

একসময় গৃহস্থবাড়ির পুকুর ব্যবহার হতো মূলত পারিবারিক পানির চাহিদা মেটাতে। পরিবারের সদস্যদের গোসল, গরু বাছুর ধোয়ানো, কাপড় ধোয়া, ইত্যাদি কাজগুলো চলতো বসতভিটার পুকুরে। আমি দেখলাম, এরকম ১৮ লক্ষ পুকুর যদি মাছ চাষের আওতায় আনা যায়, তাহলে একদিকে দেশের বাৎসরিক মাছের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে, অন্যদিকে "মাছচাষ" বিষয়টি সবচেয়ে কার্যকরভাবে সম্প্রসারিত হবে। উদ্বুদ্ধকরণ প্রচারণার মাধ্যমে এ পরিকল্পনার অনেকটাই সফল হয়। যার রেশ ধরে পুকুর, নদী, খাল, নালা, জলাশয়গুলো মাছ চাষের আওতায় আসে। মাছ চাষের সঙ্গে জড়িত কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয়। অনেক নতুন চাষি তৈরি হয়, যারা একসময় ছিলো বেকার যুবক। দুয়েক বছর মাছ চাষ করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মাছ চাষিতে পরিণত হয় বহু যুবক। তারা খাল, নদী-নালা লীজ নিয়ে শুরু করে মাছ চাষ। বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন মাছ চাষ সম্প্রসারণের জন্য বহুমুখী কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। আন্তর্জাতিক কয়েকটি সংগঠন আমাদের দেশের মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা দেখে, এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নানা প্রকল্প নিয়ে মাঠে নামে। মৎস্য গবেষণা সেক্টরেও এসব সংগঠনের সক্রিয় সহায়ক তৎপরতা চোখে পড়ার মতো।

আর পুরো এই প্রক্রিয়ার নেপথ্যে মিডিয়ার এক বিস্ময়কর ভূমিকা সূচিত হয়। টেলিভিশনের মতো একটি গণমাধ্যমে কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হিসেবে মাছ চাষের ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক প্রচারের কারণেই বাণিজ্যিক মাছ চাষ কার্যক্রম দেশের গোটা অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। একথা আজ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করা যায় যে, জাতীয় আয়ের শতকরা ৫.১৫ ভাগ অবদান মৎস্য সেক্টরের। আর সর্বমোট কৃষি আয়ের শতকরা ৪.৯২ ভাগ আসে এককভাবে মৎস্য সেক্টর থেকে। রপ্তানী আয়েরও ৫.৭১% অবদান মৎস্য সেক্টরের।

প্রসঙ্গতঃ বলতে হয়, মাস্ লাইন মিডিয়া সেন্টার ২০০২ সালে 'কৃষি উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে। যার গবেষণাক্ষেত্রই ছিলো বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান। ঐ গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মৎস্য চাষ বিষয়ক গবেষণালব্ধ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে কলমে কৃষকদের বুঝিয়ে দিতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান। তাছাড়াও কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে একজন চাষির পরিত্যক্ত একটি পুকুরকে কিভাবে সহজ উপায়ে মৎস্য চাষের আওতায় আনা যায় তার কলাকৌশল ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রচারণা জনগণকে দারুণ অনুপ্রাণিত করে। এ বিষয়টি দেশী বিদেশী বিভিন্ন জার্নালেও প্রকাশিত হয় দেশের গণমাধ্যম বিষয়ক লেখকদের মাধ্যমে।

দেশের মধ্যে ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি মাছ চাষ হচ্ছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের বহু সংখ্যক বেকার তরুণ থেকে শুরু করে বড় বড় শিল্প উদ্যোক্তা এখন মাছ চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সরেজমিন প্রতিবেদন করতে গিয়ে

দেখেছি, এক রাতেই ময়মনসিংহ থেকে প্রায় দেড় দুশো ট্রাক মাছ ঢাকার বাজারে প্রবেশ করে। ঢাকা থেকে মাছ দেশের প্রায় সকল বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে পৌঁছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মধ্যে এত বেশি মৎস্য উৎপাদন হলেও থাইল্যান্ড, মায়ানমার থেকে আমাদের দেশে মাছ আমদানি হচ্ছে। যদিও মাছ চাষি ও মৎস্য চাষ শিল্পে বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তারা নানা কারণেই বিদেশ থেকে মাছ আমদানীর বিপক্ষে। তারা বলছেন, দেশের চাষিরা যে অর্থ ব্যয় করে মাছ উৎপাদন করছে বাজারে সে হিসেবে খুব একটা লাভজনক মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানী করা মাছ খুব কম দামে বিক্রি হচ্ছে। এতে দেশের চাষি ও ব্যবসায়ীরা মার খাচ্ছে। অবশ্য মাছ চাষ সম্প্রসারণ হওয়ার পর এসব সমস্যা এখন উঠে আসছে। আরেকটি বৈপ্লবিক বিকাশ সাধিত হয়েছে চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি সেক্টরে। ৮০ থেকে ৯০ এর দশকের শেষ পর্যন্ত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় বিপুল পরিমাণ চিংড়ি উৎপাদন শুরু হয়। ওই এলাকার বহু চাষি শুরু করেন চিংড়ি চাষ। চিংড়ি রপ্তানিতেও আমাদের দেশ একটি ভালো অবস্থানে পৌঁছে যায়। আমি নিজে '৮০'র দশকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে চিংড়ি চাষের সাফল্য ও সম্ভাবনা নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন তুলে ধরি বিটিভির মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে। কয়েক বছর পর যখন বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকায় ফলোআপ করতে যাই, তখন দেখি শত শত চাষি শুরু করেছেন চিংড়ি চাষ। গড়ে উঠেছে বহু সংখ্যক চিংড়ি প্রসেসিং প্লান্ট। খুব অল্প সময়েই কৃষকরা চিংড়ি চাষ করে আর্থসামাজিকভাবে দারুণ স্বচ্ছল হয়ে ওঠেন। '৮০ দশক থেকে বাংলাদেশ চিংড়ি রপ্তানি শুরু করে। বর্তমানে বছরে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের চিংড়ি বাংলাদেশ রপ্তানি করছে। চাষ সম্প্রসারিত হওয়ার সুবাদে এই সেক্টরেও এখন অনেক সমস্যা উঠে এসেছে। চিংড়ি বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কোড মেনে চলার বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন। হোয়াইট সিনড্রম ভাইরাসের আক্রমণের কারণে অনেক স্থানে চিংড়ি চাষ কার্যক্রমে একেবারে ভাটা পড়েছে। অবস্থা মোকাবিলার জন্য কাজ করছে সরকারি বেসরকারি সংগঠনগুলো। আসলে এটিই উন্নয়নের একটি চলমান প্রক্রিয়া। চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে, বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন চাষি, সরকার, শিল্প উদ্যোক্তা সবার স্বার্থ হিসাব করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নির্ধারণ করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে।

প্রসঙ্গত: বলতে চাই, কার্প জাতীয় মাছের ডিম ছাড়ার একমাত্র প্রাকৃতিক অভয়াশ্রম চট্টগ্রামের হালদা নদী। হালদা নদী সংলগ্ন এলাকায় বহু দিন আগেই গড়ে উঠেছে একটি বাণিজ্যিক বলয়। অর্থাৎ হালদা তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের জীবিকার মূল উৎস বর্ষা মৌসুমে মাছের ডিম সংগ্রহ করা এবং তা থেকে প্রাকৃতিক রেণুপোনা উৎপাদন করে বাজারজাত করা। একমাত্র হালদা নদীতে প্রাপ্ত দেশী রুই কাতলাসহ কার্প জাতীয় মাছের ডিম সারা দেশের মৎস্য খামারীদের দেশী প্রাকৃতিক মাছের পোনার চাহিদা পূরণ করেছে ও করছে। এদিকে যশোরের চাঁচড়া অঞ্চলে মাছের কৃত্রিম পোনা উৎপাদনের কার্যক্রম বিশাল একটি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে এই মাছের কৃত্রিম পোনা উৎপাদন কার্যক্রমের ওপর। এর মধ্য দিয়ে দেশে প্রতি বছর চাহিদা অনুযায়ী পোনার যোগান পাওয়া যাচ্ছে। খামার বেড়েছে, হ্যাচারি বেড়েছে, মাছ চাষ যখন সামগ্রিকভাবে একটি শিল্পে রূপ নিয়েছে তখনই এসেছে আরো বড় বড় সমস্যা। মাছের অন্তঃপ্রজনন বা ইনব্রিডিং-এর মতো সমস্যাও দেখা দিয়েছে এখন। যেহেতু ব্যাপকভাবে মাছের চাষ ও কারবার চলছে সেহেতু আমাদের দেশী মাছের আসল জাত রক্ষার বিষয়টিও এসেছে আলোচনায়। এই সমস্যা নিয়েও বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। বাজারে যখন দেশী জাতের সুস্বাদু মাছ দুর্লভ হয়ে উঠতে শুরু করেছে তখন ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র ফিস সিড কমপ্লেক্স নামের একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারিতে শুধুই উৎপাদন করা হচ্ছে দেশী বিপন্ন প্রায় জাতের মাছের পোনা। দেশব্যাপী আলোচনায় এসেছে এই হ্যাচারি।

মৎস্য সেক্টরে বর্তমানের এই সাজ সাজ পরিস্থিতি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। চাষি, সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষক, মিডিয়া সবারই স্ব স্ব অবস্থানের নিরবিচ্ছিন্ন একটি ভূমিকা সক্রিয় থাকার কারণেই আজকে মৎস্য সেক্টরে অভূতপূর্ব সাফল্য চোখে পড়ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বও পাচ্ছে এই সেক্টর। ২০০৩ সাল পর্যন্ত মৎস্য খাত ছিলো কৃষির সার্বিক হিসাবের মধ্যে। অর্থাৎ জাতীয় লাভক্ষতির হিসাবে মৎস্য খাতের আলাদা গুরুত্ব তুলে ধরা হতো না। গত বছর অর্থাৎ ২০০৪ সালের স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় সামগ্রীক কৃষি সেক্টরের ক্ষয়ক্ষতির বাইরে একটি হিসাব করা হয় মৎস্য সেক্টর নিয়ে। আর ক্ষয়ক্ষতির ওই জরীপটি চালায় জাতিসংঘ, জাতিসংঘের সহযোগী সংগঠন, ৩টি দাতা সংগঠনসহ মোট ৪৩টি সংগঠন। সংগঠনগুলোর যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে মাছ চাষের ৬ লক্ষ পুকুর ভেসে গিয়ে ৬'শ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বন্যার মতো অবধারিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই বিশাল ক্ষতির চিত্র আলাদাভাবে উপস্থাপন না করা হলে নিশ্চিত করে বোঝা যেত না। জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে মৎস্য সেক্টর আজ অনেক বেশি গুরুত্বের দাবি রাখছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, '৮০'র দশকের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত ২৫ বছরে দেশে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তার পেছনে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা উদ্যোগী ও বেকার তরুণদের যারা বিভিন্ন মাধ্যমের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে

মাছ চাষ করে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন। ভাগ্য পরিবর্তনকারী এসব মাছ চাষিরা এখন দেশের উন্নয়ন অংশীদার। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর উচিৎ তাদের এই অংশীদারিত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া। এ ক্ষেত্রে মাছ চাষিদের কয়েকটি দাবি ও সুপারিশ আমি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছি। তাহচ্ছে এক. পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে মাছ আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা, দুই. মাছের খাদ্য সহজলভ্য করা, তিন. মৎস্য খামার ও হ্যাচারিকে কৃষি শিল্প গণ্য করে বিদ্যুৎ বিল কমানো, চার. ইনব্রিডিং বা অন্তঃপ্রজনন সমস্যা রোধকল্পে গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া, পাঁচ. মাছ চাষের ওপর প্রচলিত অবস্থার চেয়ে আরো সহজ শর্তে কৃষি ঋণ দানের ব্যবস্থা করা, ছয়. সরকারি মৎস্য গবেষণা দপ্তরগুলোকে ঢেলে সাজিয়ে সেগুলোর কার্যক্রমকে জোরদার করা, সাত. চিংড়ি শিল্পে আন্তর্জাতিক কোড মেনে চলার ওপর সরকারিভাবে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি। সবচেয়ে আগে প্রয়োজন মৎস্য সেক্টরের জন্য একটি সার্বজনীন ও নিরপেক্ষ জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা। সেই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও মৎস্য চাষি ও হ্যাচারি মালিকদেরকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো যে যে কৌশল নিয়ে কৃষকের দ্বারপ্রান্তে পৌছাতে চায়, তার একটি বড় অংশ পূরণ করেছে টেলিভিশন মিডিয়া তথা বিটিভির মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান। তৃণমূল মানুষেরা একদিকে চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে রপ্ত করেছে মাছ চাষের কলাকৌশল। তারই ধারাবাহিকতায় আমি গত ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে চ্যানেল আইতে হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান শুরু করার পর নতুন চিন্তা চেতনায় বিশাল এই অর্থনৈতিক সেক্টরকে নিয়ে কাজ শুরু করি। আমি দেখলাম, ১৯৮২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দেশের যে বিশাল জনগোষ্ঠী মৎস্য চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে বর্তমান সময়ে এসে তারা বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি। তাদের রয়েছে বাজারজাতকরণের সমস্যা, সরকারি গবেষণাক্ষেত্রে সহযোগিতার অপ্রতুলতা, সুস্থ পোনার সংকট, মাছের খাদ্যের চড়া দাম, বিদেশ থেকে আমদানী করা মাছের সহজলভ্যতা ইত্যাদি। বিষয়গুলো একে একে তুলে ধরি হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান খুব কাছ থেকে বিষয়গুলো উপলব্ধি করেন ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ নেন। তারপরও মৎস্য চাষিদের বহু সমস্যা রয়েই গেছে। আশার কথা হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের পত্র পত্রিকাগুলোতেও কৃষির সকল সেক্টরের পাশাপাশি মৎস্য সেক্টরের নানা বিষয়ও উঠে আসছে। উঠে আসছে এই সেক্টরের বিভিন্ন সাফল্যের গল্প। যা আমাদের দেশের মৎস্য খাত তথা সার্বিক কৃষি উন্নয়নের জন্যই ইতিবাচক একটি দিক। আমি মনে করি কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে গণমাধ্যমের এই এগিয়ে আসাটাও একদিনে অর্জিত হয়নি। এ প্রক্রিয়াটিও কার্যকর হতে সময় লেগেছে দু'যুগেরও বেশি। এটিও আমাদের জন্য অনেক বড় একটি অর্জন। আর অর্জন এখানেই যে, সরকারি কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তো সম্প্রসারণ কর্মী রয়েছেই কিন্তু একজন সম্প্রসারণ কর্মীর কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক হতে পারে মিডিয়া। মিডিয়া ও সম্প্রসারণ বিভাগ যখন একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করেছে ও করছে তখনই দেশের কৃষিতে সূচিত হচ্ছে অগ্রগতির সুবাতাস।

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই, বাংলাদেশ অমিত সম্ভাবনার দেশ। এদেশের মাটি, পানি সবই উন্নয়ন সম্ভাবনার এক একটি উর্বর ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রগুলোতে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারলে জাতীয় অর্থনীতি দিনের পর দিন মজবুত হতে থাকবে। জাতীয় মৎস্য পক্ষ ২০০৫ উপলক্ষে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সকল মৎস্য চাষি ভাইদের শুভেচ্ছা জানাই। শুভেচ্ছা জানাই এ সেক্টরের সঙ্গে জড়িত সবাইকেসহ সমগ্র দেশবাসীকে।

** শাইখ সিরাজ, কৃষি উন্নয়ন কর্মী, পরিচালক ও বার্তা প্রধান, চ্যানেল আই, ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড।*

কার্পের সাথে দেশীয় ছোট ও মাঝারী মাছের মিশ্রচাষ, সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ
(Self-Recruiting Species (SRS) in Aquaculture and their Role in Livelihoods)

ডঃ এম এ ওহাব, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ফারুক-উল-ইসলাম ও মোঃ রাকিব-এল-আরিফ, আইটিডিজি-বাংলাদেশ

Abstract

Self-recruiting Species (SRS) play a very important role in rural livelihoods of poor farmers in terms of food, nutrition, income and biodiversity particularly in environmentally vulnerable areas. Whereas capture fisheries and aquaculture have received much attention in development and research, the role of these aquatic animals from farmer-managed aquatic systems [(FMAS) (known as SRS)] has long been overlooked. The purpose of this project is to characterize the role of SRS in different aquaculture systems and identify management strategies to maintain or increase productivity of and access to such resources by the poor. The project was also able to identify 10 priority species, farmers livelihoods priorities, potential areas for aquaculture diversification and developed management strategy of SRS in farmer managed systems with better ecological and livelihoods understanding. Examined of SRS as issue of bio-diversity; identified threats to SRS in aquaculture and fisheries management.

SRS in aquaculture were evaluated from the perspective of people dependent on them, in terms of well being, gender, resource access and broader livelihoods. Overall SRS are most important to the poorer households. SRS are especially important during the dry season when access to other water bodies becomes limited. Trials show that incorporating SRS into conventional polyculture systems is beneficial overall and has no measurable negative effect on the production of stocked fish.

These findings and outputs indicate that SRS are a valuable resource for the rural poor, which can be synthesized in a set of practical guidelines for aquaculture development and extension practitioners and disseminated through a wide range of direct linkages, are expected to maintain and likely enhance the output of SRS in a range of aquaculture systems and environmental management programs.

বাংলাদেশে পুকুরে, ধানক্ষেতে, পেনে, খাঁচায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছচাষ হচ্ছে। এ চাষ সাধারণতঃ ক্ষুদ্র পরিসরে এবং বাণিজ্যিকভাবে হয়ে থাকে। পুকুর, ধানক্ষেতের বড় গর্ত, নিচু ধানক্ষেত, রাস্তার পার্শ্বের নালাসহ মুক্ত জলাশয়ে মাছচাষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশী মাছের উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি, যা গরীবদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোতে দেশীয় ছোট ও মাঝারী মাছের উৎপাদন বিগত কয়েক বছরে বেশ হ্রাস পেয়েছে। দেশীয় ছোট মাছ এসআরএস[১] গোত্রভুক্ত। তাছাড়া মাছের জীব-বৈচিত্র্যও ক্রমান্বয়ে কমছে। প্রাকৃতিক বাসস্থান নষ্ট হয়ে

[১] **এসআরএস (Self Recruiting Species)** ঃ ঐ সব জলজ প্রাণী যাদেরকে চাষের জন্য সব সময়ই চাষির ব্যবস্থাধীন জলাশয়ে বা পুকুরে পুনঃপুনঃ মজুদ করতে হয় না, অর্থাৎ এরা প্রাকৃতিক ও চাষির ব্যবস্থাধীন জলজ পরিবেশে নিজে নিজেই বংশবিস্তার করে। এসআরএস বলতে শুধু দেশী ছোট মাছ (এসআইএস) মাড়াও চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্যান্য এ ধরনের প্রাণীকে বুঝায়। এরা দেশী (indigenous) বা বহিরাগত (exotic) প্রজাতিও হতে পারে।

এসআইএস (Small Indigenous Species) ঃ যে সকল দেশী মাছের পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় দৈহিক আকার ২৫ সে.মি. বা ৯ ইঞ্চির চেয়ে কম তাদেরকে এসআইএস বলে।

যাওয়া, ধ্বংসাত্মক মৎস্য আহরণ, মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার এবং প্রচলিত মাছচাষ পদ্ধতিতে দেশী মাছ বাদ দিয়ে বিদেশী মাছ চাষের কারণে বিলুপ্ত ও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মুক্ত জলাশয় থেকে অত্যাধিক হারে মাছ আহরণ এবং প্রচলিত কার্প চাষাবাদের ফলে দিন দিন দেশী মাছের বাসস্থান নষ্ট হচ্ছে। মাছের প্রাপ্যতা ক্রমাগত কমছে এবং মাছের জীব-বৈচিত্র্যও হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের বিপর্যয়ের কারণে পুকুরে, ধানক্ষেতে, খালে-বিলে দেশীয় মাছের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।। স্বাদ, পুষ্টি, অর্থ এবং খাদ্যের বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি 'এসআরএস' মাছের উৎপাদনের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। এসব দেশী মাছ সংরক্ষণের স্বার্থে বিজ্ঞানভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। যা মাছচাষ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রার সংযোজন করতে পারে। তাই আইটিডিজি-বাংলাদেশ (ITDG-B)-এর গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মাছ চাষিকে কার্পজাতীয় মাছের সাথে দেশী মাছের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন মাছচাষ পদ্ধতিতে এসআরএস প্রজাতির ভূমিকা নির্ধারণ, দেশী মাছচাষ উপযোগী পুকুরের প্রকৃত ধরন, মাছগুলোর প্রাকৃতিক প্রজনন ও খাদ্য গ্রহণের স্বভাব সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা দেয়া। এ ছাড়াও গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে চাষি কোন কোন দেশী মাছ চাষ করা যাবে। এ থেকে একটি উন্নত আধানিবিড় মাছচাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা থেকে প্রাকৃতিক মাছও আহরণ করা যাবে এ ব্যাপারেও সুস্পষ্ট ধারণা পাবে। ফলে গ্রাম পর্যায়ে দেশী মাছ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক প্রজননে উৎসাহী হবে। যা গ্রামীণ গরীব জনগোষ্ঠীর সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশে মাছের সামগ্রীক উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

এ গবেষণা প্রকল্পটি ৪ বছর মেয়াদী। প্রকল্পটি আইটিডিজি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের ষ্টারলিং ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এর মাঠ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণ-মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্প ৩ বছরের গবেষণা এবং প্রয়োগ কার্যক্রম শেষ করেছে। এবং বর্তমানে (এক বছরের জন্য) সম্প্রসারণের কাজ চলছে। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসআরএস গোত্রভুক্ত মাছ প্রাকৃতিক এবং ব্যবস্থাপনাধীন পরিবেশে গ্রামীণ গরীব জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণালব্ধ ফলাফল বক্স-১ তে উল্লেখ করা হলো।

থাইল্যান্ডেও *(Yoonpundh 1996)* বিভিন্ন চাষি পর্যায়ে বিভিন্ন কৌশলে এসআরএস-এর প্রর্দশনী করেছে। তাতেও দেখা গেছে যে এসব প্রাকৃতিক মাছ পুকুরে মজুদ করা ও ব্যবস্থাপনায় ভাল ফল দেয়। থাইল্যান্ডে *(Amechi 1995)* দেখা গেছে যে, নিবিড়ভাবে পরিচালিত পুকুর থেকে মোট উৎপাদনের শতকরা ২০-৪০ ভাগ প্রাকৃতিক মাছ আসে অতিরিক্ত উৎপাদন হিসেবে। উত্তর থাইল্যান্ডের বন্যাপ্লাবিত স্থানে মজুদকৃত মাছচাষ পদ্ধতির ধানক্ষেত থেকে মোট উৎপাদনের ২০-৮০% হলো প্রাকৃতিক মাছ *(Little et al 1996)*। বিশেষতঃ গরীব বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে ছোট পুকুর ব্যবস্থাপনায় কার্পজাতীয় মাছকে সাধারণতঃ **ক্যাশ মাছ** (Cash fish) হিসেবে এবং দেশীয় প্রাকৃতিক মাছকে **ফুড ফিস** (Food fish) হিসেবে গণ্য করা হয়। শুধু কার্পজাতীয় মাছের চাষ গ্রামীণ এলাকায় গরীব পরিবারের পুষ্টি যোগানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে *(Wahab, Thilsted & Hoq 2003)*।

প্রচলিত মাছচাষ পদ্ধতিতে ছোট-মাঝারী দেশী মাছ বা এসআরএসকে কখনই কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি চাষ করতে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এদের অধিকাংশকেই কার্পের সাথে চাষের জন্য অবাঞ্ছিত বা ক্ষতিকর মনে করা হয়

বক্স-১ ঃ *গবেষণালব্ধ ফলাফল*

পঞ্চগড়ে চাষি পর্যায়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা কার্যক্রমে ১০ শতক পুকুরে ৬০০টি কার্পজাতীয় মাছের সাথে অতিরিক্ত ৫০০টি কৈ, শিং, মাগুর (শতক প্রতি কৈ ২০ টি, শিং, ১৫ টি, মাগুর ১৫ টি) ছাড়া হয়েছিল। যদিও এর সাথে মলা, পুঁটি, টেংরা, পুচি ইত্যাদি মাছ নিয়ন্ত্রিতভাবে ঢুকানো হয়েছে। এ ধরনের নিম্ন মজুদ ঘনত্বে কার্পের ওপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। কারণ চাষি বাইরে থেকে ঢুকানো এসআরএস গোত্রভুক্ত মাছগুলোকে পুনঃপুনঃ আহরণ করে মজুদঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ রাখে।

এ মডেলে ৮ থেকে ৯ মাসে কার্প ও দেশী মাছের গড় উৎপাদন শতক প্রতি ১০ কেজি পাওয়া গেছে। যেখানে কার্পের উৎপাদন ছিল শতক প্রতি ৭ কেজি এবং দেশী মাছ শতক প্রতি ৩ কেজি। স্বাভাবিক কার্পের পুকুরে (যেখানে কোন অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি) দেশী মাছ পাওয়া গেছে গড়ে শতক প্রতি ১.৫ কেজি। অর্থাৎ সামান্য অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনায় স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ বিভিন্ন জাতের দেশী মাছ পাওয়া সম্ভব। এ মডেলে চাষিদের কাছে কৈ ও শিং এর চেয়ে দেশী মাগুরের ফলন উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয়েছে। একজন অভিজ্ঞ চাষির মতে ২৫০ গ্রাম টেংরার ব্রুড ধানক্ষেত সংলগ্ন পুকুরে রাখলে ৩ থেকে ৩.৫ কেজি টেংরা মাছ পাওয়া যায়।

স্বল্প পরিসরে কম পুঁজিতে দেশী মাছসহ কার্পের চাষ করলে প্রায় আড়াইগুণ লাভ পাওয়া যায়। গবেষণা-

এবং কার্প চাষাবাদের জন্য দেশীয় মাছগুলোকে কীটনাশক বা বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু অনেক গ্রামীণ চাষিকে দেখা গেছে যে তারা পুকুরে কার্পজাতীয় মাছের সাথে নির্দিষ্ট কিছু ছোট-মাঝারি দেশী মাছ রাখে। নানাভাবে তারা পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেত, ডোবা-নালা থেকে বছরের কোন সময় চাষের পুকুরে এদেরকে ঢুকায় যা তাদের পারিবারিক পুষ্টি, আয় ও স্বাদের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যতের খাদ্য–পুষ্টি নিরাপত্তা এবং জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে মাছ চাষকে মৎস্য প্রজাতি ও পদ্ধতির বহুমুখীকরণ করা খুবই জরুরি।

পচা পুকুর, মৌসুমী পুকুর, পাগার, রাস্তার পাশের খাল, সেচ খাল, ১২ লক্ষ হেক্টর ধানক্ষেত (২.৫ লক্ষ হেক্টর নিচু ধানী জমি), বন্যা কবলিত এলাকায় বাড়ী সংলগ্ন ট্রাপ পুকুর, প্লাবনভূমির ছোট গর্ত ইত্যাদি যেখানে বছরে ৪ থেকে ৭ মাস পানি থাকে সেসব স্থান আধানিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের খামারের জন্য উপযোগী স্থান হতে পারে এবং সেগুলো হতে পারে এসআরএস বা প্রাকৃতিক মাছের জন্য উপযোগী চাষযোগ্য এলাকা।

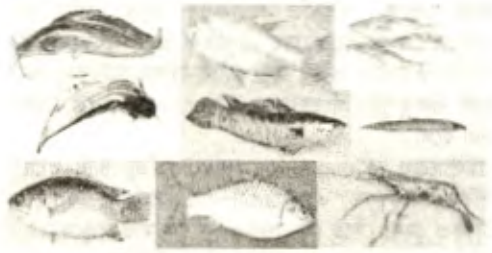

এই প্রকল্পের চাষিরা স্বাদ, পুষ্টি, আয় এবং ছোট বাচ্চা, মহিলা ও বৃদ্ধদের পছন্দের ভিত্তিতে কিছু জনপ্রিয় এসআরএস প্রজাতিকে চাষের জন্য অগ্রাধিকার দিয়েছে, যেমন– শিং, দেশীয় মাগুর, টেংরা, কৈ, পুঁটি, মলা, স্বাদু পানির ছোট চিংড়ি, টাকী, গুতুম ইত্যাদি।

এসআরএস/অমজুদকৃত মাছের গুরুত্ব ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য: কম চর্বিযুক্ত মাছ হিসেবে গ্রামাঞ্চলে মাগুর, শিং, কৈ, পুঁটি মাছের গুরুত্ব বেশি। আগষ্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মঙ্গাপীড়িত মাসগুলোতে গ্রামের গরীব লোকেরা পরিবারের তরকারি ও আয়ের জন্য পুকুর-ডোবার দেশী মাছের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ছোট-মাঝারী দেশী মাছ সংখ্যায় বেশি হয় বলে পরিবারের সদস্যদের মাঝে বন্টনের সুবিধা এবং খাওয়ার সময় মহিলারাও কিছু খেতে পারে।

- এসআরএস মাছকে জলাশয় বা পুকুরে পুনঃপুনঃ মজুদ করতে হয় না অর্থাৎ ছোট-মাঝারি দেশী মাছ প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশে নিজে নিজেই বংশবিস্তার করে। এ জন্য চাষিকে বাড়তি শ্রম, সময় বা খরচ করতে হয় না। তাই এ মাছগুলো বিশেষত গরীব চাষিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এগুলো মাছের পোনা ক্রয়ের খরচ কমিয়ে চাষির মাছচাষের খরচ কমায়।
- এসআরএস মাছে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন এবং অত্যাবশ্যকীয় এ্যামাইনো এসিড সঠিক পরিমাণ উপস্থিত যা মানবদেহে কোলেষ্টেরলের মাত্রা বাড়ায় না।
- এ মাছগুলোতে ৭২% পানি, ১৯% প্রটিন, ৮% ফ্যাট, ০.১৫% ক্যালসিয়াম, ০.২৫% ফসফরাস এবং ০.১০% ভিটামিন এ, বি, সি এবং ডি আছে (এফএও ১৯৯১)।
- মাগুর, কৈ, শোল, বাইম/গুচি,পুঁটি- এসব মাছে অত্যাবশ্যকীয় পলি আনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড বিদ্যমান যা মানুষের ভ্রূণাবস্থায় চোখ ও মস্তিষ্কের গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদাত্রী মায়েদের রক্তশূন্যতা থেকে রক্ষায় এসআরএস মাছের অবদান অসীম। মলা মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' আছে যা শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধ মানুষের চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধিসহ রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। মলা মাছ খাওয়ার সময় মাথা ও চোখ ফেলে দেয়া উচিত নয়, কারণ মোট ভিটামিনের ৫৩% এ অংশে থাকে। গর্ভবতী মহিলাদের শোল, টাকী ও টেংরা মাছ খাওয়ালে বাচ্চার মস্তিক ও চোখের গঠন সঠিক ও স্বাভাবিক হয় এবং বাচ্চাদের হাড় ও দাঁতের গঠনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

খরা প্রবণ, দীর্ঘ মেয়াদী শীত ও ভাল কার্পের পোনা সহজলভ্য নয় এবং ধানক্ষেত সংলগ্ন ছোট পুকুর আছে এমন এলাকায় পুষ্টি বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এই চাষ পদ্ধতিটি অধিক গুরুত্ব বহন করে। তবে ধনী লোকেরাও পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে পারেন। মাছ খাওয়া ও বিক্রির দিক থেকে গরীব লোক ধনীর চেয়ে বেশি লাভবান হবে। বিল, হাওর, বাঁওড়, নদী তীরবর্তী প্লাবনভূমির চাষিরা এই কৌশলে আগ্রহী নাও হতে পারে, কারণ তারা পুকুরে চাষের চেয়ে মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ আহরণকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

পোনা প্রাপ্তি

প্রাকৃতিকভাবে এসব মাছ পুকুরে, ধানক্ষেতে, প্লাবনভূমিতে, খালে-বিলে এবং নদীতে পোনা দেয়।

জুলাই-আগষ্ট মাসে বৃষ্টির পর টানা দুই তিন দিন চড়া রোদ হলে ধানক্ষেত থেকে সহজেই কৈ, শিং, মাগুরের পোনা ধরা যায়। যদিও চাহিদার তুলানায় তা অপর্যাপ্ত। তবে গ্রাম পর্যায়ে পুকুরে, জলাশয়ে ডিমওয়ালা দেশী মাছ সংরক্ষণই পোনা পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়।

পুকুরের ধরন

ছোট পুকুর, ধানক্ষেত সংলগ্ন পুকুর, নিচু জলাশয়ের সাথে গভীর গর্ত, খালের সাথে সংযুক্ত পুকুর, এবং অগভীর পুকুর হলো এ ধরনের মাছ চাষের জন্য উপযোগী। দেশী মাছ চাষের জন্য পুকুরের ঢাল এবং নালার সাথে ধান/পাটক্ষেতের সংযোগের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কৈ, মাগুর এবং শিং এর জন্য উঁচু পাড় বা বানা দিয়ে প্রতিরোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশি গভীর পুকুরে শিং, মাগুরের পোনা মারা যেতে পারে। অনেক সময় এরা পুকুর থেকে ধান ক্ষেতের স্বল্প গভীরতায় এসে ডিম ছাড়ে। টেংরা সাধারণতঃ ধানক্ষেত সংলগ্ন গভীর জায়গায় এবং পুঁটি-মলা পুকুরে ডিম দেয়।

মজুদ ঘনত্বের ধরন

শতকে ৬০টি হিসেবে (সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প, সরপুঁটি/তেলাপিয়া, রুই, কাতলা, মৃগেল, কমনকার্প, গ্রাসকার্প) কার্পজাতীয় মাছের সাথে শতক প্রতি ৫০টি কৈ, শিং, মাগুর (কৈ ২০টি, শিং ১৫টি এবং মাগুর ১৫টি) ছাড়া যেতে পারে। পাপাশি পাশের উৎস থেকেও নির্দিষ্ট কিছু দেশী মাছ পুকরে ঢুকানোর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। তবে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে চাষি মজুদ-ঘনত্ব কমবেশি করতে পারে। তবে বাহিরের পোনা মজুদের ওপর বেশি জোর দেয়ার প্রয়োজন নেই তাছাড়া। এসআরএস-এর পোনার প্রাপ্যতাও তেমন সহজলভ্য নয়।

সুবিধাজনক মাছের প্রজাতি

দেশী মাগুর, টেংরা, পুঁটি, মলা, শিং এগুলোকে সুবিধাজনক প্রজাতি হিসেবে নির্বাচন করে চাষিরা ভালো ফল পেয়েছে। এছাড়াও গবেষণায় পুষ্টি, স্বাদ, আয়, প্রাপ্যতা, দাম ও পারিবারিক পছন্দের ভিত্তিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে মাগুর, কৈ, শিং, পুঁটি, চিংড়ি/ইচা, টাকি, টেংরা, শোল, মলা ও গুত্তুম- এ ১০টি দেশী মাছ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে।

দেশী মাছ চাষের মাসওয়ারী ধাপসমূহ	
ফাল্গুন-চৈত্র	ব্রুড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিকল্পনা, মাছ ধরা ও পুনঃমজুদ।
চৈত্র-বৈশাখ	ডিমওয়ালা মাছ পুকুরে দেয়া, নার্সারি করা, বানা তৈরি, পাড় উঁচু করা।
জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়	পুকুর প্রস্তুতি ও কার্প মজুদ, জাল টেনে পুকুরে পূর্বের মাছের ঘনত্ব দেখা, বানা ও জালের ব্যবস্থা নেয়া।
শ্রাবণ-ভাদ্র	প্রাকৃতিক উৎস বা হ্যাচারি / নার্সারি থেকে দেশী মাছের পোনা সংগ্রহ, ট্রাপ, আঘ, বানা ব্যবহার নির্দিষ্ট কিছু মাছ ঢুকানো, ধানক্ষেত্রে মাছ ঢুকানো, বন্য মাছ আকর্ষণের কৌশল নেয়া।
ভাদ্র-আশ্বিন	এমাছ বিক্রি করে বা খেয়ে মজুদ ঘনত্ব ঠিক রাখা, রাক্ষুসে পোনা নিয়ন্ত্রণ।
কার্তিক-মাঘ	রোগ প্রতিরোধ চুন দেয়া, চূড়ান্ত মাছ ধরা।

খাদ্য

স্বাভাবিক খাদ্যের পাশাপাশি চাষিরা সিদ্ধ ভাঙ্গা চাল, তিলের খোসা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে। চাষিরা গোবরের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি করে শিং, মাগুরের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধি করেছে। কোনো কোনো চাষি মাগুরের খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়ার সাথে অল্প পরিমাণ গরুর রক্তও ব্যবহার করেছে। বেশি আমিশযুক্ত খাবার হিসেবে 'ফিশমিল' এর তথ্য চাষিদের জানা থাকলেও তারা তা ব্যবহার করে উৎপাদন ব্যয় বাড়ানোর ঝুঁকি নেয়নি।

বাইরের মাছকে আকর্ষণ করা: বাইরের মাছকে আকর্ষণ করার জন্য কোনো কোনো চাষি পুকুরে গরুর ভুড়ি ও কিছু কোপঝাড় দিয়েছে, তবে ছোট পুকুরে গরুর ভুড়ি ব্যবহারে পানি দূষণ থেকে সাবধান থাকা উচিত।

সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ

বন্যাপ্রবণ এ দেশের গ্রামাঞ্চলে পুকুর ও ধানক্ষেতকে মাছচাষের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই প্রাকৃতিক মাছ মুক্ত জলাশয় যেমন- রাস্তার পার্শ্বের খাল, বিল, নিচু জলাভূমি, ধানক্ষেত ও বৃহৎ জলাশয়ের গভীর অংশে সংরক্ষণ করা গেলে ছোট পুকুর এবং ধানক্ষেতের মৎস্য সম্পদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পরবে। এ কাজ গ্রামের যেকোন স্থানে এসআরএস সংরক্ষণ করলে গ্রামের পুকুরগুলোতে এসব মাছের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পাবে।

পুকুরে ব্রুড মাছ রেখে দেয়া

জলাশয়ের বা পুকুরের মাছ পুরোপুরি না ধরে কিছু ব্রুড মাছ রেখে দেয়া যেতে পারে। পুকুর শুকিয়ে গেলে কুয়া করে ব্রুড মাছ রেখে দেয়া যায়। এছাড়াও বাহির থেকে ব্রুড মাছ এনে পুকুরে ছাড়া যেতে পারে।

নিয়ন্ত্রিতভাবে পুকুরে কিছু দেশী মাছ প্রবেশ করানো বা আর্কষণ করা

ধানক্ষেত সংলগ্ন পুকুরে এ কৌশল বেশ উপযোগী। এছাড়া নালার মাধ্যমেও প্রাকৃতিক জলাশয়, ধানক্ষেত থেকে দেশী মাছ প্রবেশ করানো যায়। যদিও কিছু মাছ ঘন ঘন বাচ্চা দেয় তবে পুনঃপুনঃ আহরণ করলে মজুদকৃত কার্পজাতীয় মাছের উৎপাদনের ওপর তেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। বর্ষার শেষের দিকে জাল, বানা, ট্রাপ ব্যবহার করে ধানক্ষেত সংলগ্ন পুকুরের চাষিরা নির্দিষ্ট কিছু দেশী মাছ পুকুরে ঢুকায়। মাছকে আকর্ষণ করার জন্য অনেক চাষি পুকুরে বিশেষ খাবার বা ডালপালা দিয়ে রাখে।

দেশী মাছের পোনা মজুদ করা

যেখানেই সম্ভব কার্পজাতীয় মাছের সাথে কিছু দেশী মাছের পোনা যেমন মাগুর, মলা, পুঁটি, শিং, কৈ ইত্যাদি পুকুরে সরাসরি মজুদ করা যেতে পারে। এগুলো প্রাকৃতিক উৎস হতে ধরে বা ক্রয় করে মজুদ করা যেতে পারে। তবে বাজার থেকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পোনার মৃত্যুহার বেশি হয়। সম্প্রতি কিছু হ্যাচারিতে এসব মাছের কৃত্রিম প্রজননের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

শুকনা মৌসুমে পুনঃ পুনঃ পুকুর সেচে ধ্বংসাত্মকভাবে দেশী মাছ ধরা বন্ধ করা ঃ গ্রামের অধিকাংশ পুকুরে শুষ্ক মৌসুমে ২-৩ বার সেচ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে মাছ (চালানী, দেশী মাছের ব্রুড) ধরা হয়। মৎস্যজীবী, আহরণকারী ও চাষিদের এটা অনুধাবন করা দরকার যে এভাবে সেচ দিয়ে মাছ ধরা দেশী প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায়। এভাবে মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে শুকনা মৌসুমে ব্রুড মাছ রক্ষা পাবে। কোন গ্রামের ৪-৫টি পুকুরে ও নিচু জলাশয়েও যদি ধ্বংসাত্মকভাবে প্রাকৃতিক মাছ ধরা না হয় তবে অনেক প্রাকৃতিক মাছ পরবর্তী বছরের জন্য থেকে যাবে।

গ্রামভিত্তিক দেশী মাছের ব্রুড সংরক্ষণ ঃ প্রতি গ্রামের ২/১ টি নিচু জায়গায় দরকার হলে সামান্য খনন করে সুবিধাজনক জলাধার তৈরি করে কিছু দেশী মাছের ব্রুড সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এ উদ্যোগের জন্য মৎস্য বিভাগকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকেও দায়িত্ব নিতে হবে। সুবিধাজনক যেকোন স্থানে, পরিত্যক্ত পুকুর বা অচাষকৃত পুকুরকে এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। শুষ্ক অঞ্চলে সেচ নালা, খননকৃত গভীর জলাধার ব্রুড সংরক্ষণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বড় জলাশয়ে দেশী মাছ সংরক্ষণ (ছোট অভয়াশ্রম) ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যেসব পুকুর জলাশয় ইজারা দেয়া হয় সেগুলোর কোন একটি জায়গায় প্রয়োজনে জাল দিয়ে ঘিরে শুকনো মৌসুমে ডিমওয়ালা দেশী মাছের সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত মাছ ধানক্ষেতে/পুকুরে বর্ষার সময় ছড়িয়ে যাবে এবং সামগ্রীকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ব্যক্তি পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের বাৎসরিক পুকুরে অথবা মৌসুমী পুকুরে পানি সরবরাহ করে শুকনা মৌসুমে কিছু দেশী মাছ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এভাবে পুকুরও হতে পারে দেশী মাছের অভয়াশ্রম।

আইপিএম বাস্তবায়ন ঃ সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা কার্যকর হলে ধানক্ষেতসহ নিচু এলাকায় দেশী মাছের মৃত্যুহার কমবে ও প্রজনন বেড়ে যাবে যা ক্রমে দেশী মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

মৎস্য সহনশীল স্লুইস গেট ব্যবস্থাপনা ঃ স্লুইস গেট এর মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনায় ধান চাষের সাথে মাছের প্রজনন ও চলাচলের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে। এ ধরনের উদ্যোগ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও গ্রামবাসীদের মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে নিতে হবে। তাতে প্রাকৃতিক দেশী মাছের উৎপাদন ধানক্ষেতে, প্লাবনভূমি ও পুকুরে অনেক বৃদ্ধি পাবে।

গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ ঃ গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় দেশী মাছের চলাচল এবং প্রজননের জন্য কার্যকরভাবে বিবেচনা করা উচিত। বিশেষ করে কিছু কালভার্ট, ব্রীজের মুখে দেশী মাছ, বিশেষ করে পোনা, ব্রুড ধরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।

সুপারিশমালা

- অনেক এসঅরএস গ্রামীণ মাছচাষের বৈচিত্র্যতার ক্ষেত্রে নতুন প্রজাতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, এগুলোকে পুকুর থেকে সম্পূর্ণভাবে সরানো উচিত নয়। এগুলো গরীদের জন্য ছোট পর্যায়ে চাষযোগ্য। এদেরকে পুনঃপুনঃ মজুদের প্রয়োজন পরেনা, তাই এদের রক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রহিত করা উচিত।
- পুকুর তৈরির সময় **কীটনাশক প্রয়োগে** এসআরএস/প্রাকৃতিক প্রজাতিগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস নিরুৎসাহিত করা উচিত।
- ডিমওয়ালা মাছ খাওয়া, ধ্বংসাত্মক আহরণ, অপরিকল্পিত গ্রামীণ রাস্তা, পানির বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা মাছের পরিবেশকে ধ্বংস করে, কীটনাশক প্রয়োগ, ঘন জালের ব্যবহারকে অবশ্যই নিরুৎসাহিত করা উচিত। প্রশাসনিক সমন্বয় ও সামাজিক এবং কারিগরী কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। শুকনো মৌসুমে এবং বর্ষার আগে এসআরএস-এর ধ্বংসাত্মক আহরণ বন্ধ করা উচিত।
- **পানি অবকাঠামো/বণ্টনে** মাছ এবং ধান উভয়কে সমভাবে বিবেচনায় রাখা উচিত। পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি প্রকৌশলীদেরকে বিভিন্ন ইস্যুতে (মাছ, জীব-বৈচিত্র্য) প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার।
- মৎস্যচাষ জোরদারকরণ এবং জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় ভারসাম্যপূর্ণ নজর প্রদান করা উচিত। মৎস্যচাষ অবশ্যই পরিবেশসহনশীল হওয়া উচিত।
- গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করার সময় মাছের চলাচল যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে নজর দেয়া উচিত এবং কিছু নির্দিষ্ট কালভার্ট বা ব্রিজের আশেপাশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাছ ধরা বন্ধ রাখা উচিত।
- জলাশয়গুলো ইজারার সময় যুব অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সংরক্ষণ কার্যক্রমকে মূল্যায়নে আনা উচিৎ।
- **গ্রামভিত্তিক এসআরএস সংরক্ষণের সম্মিলিত উদ্যোগ** নিতে হবে এ ধরনের কার্যক্রমকে সহয়তা করার জন্য জনপ্রতিনিধি, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি, ইউনিয়ন পরিষদ এবং মৎস্য অধিদপ্তরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

কিছু ক্ষেত্রে এসআরএস ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

মৎস্য সেক্টরে মাইক্রো ক্রেডিটের গুরুত্ব
(Importance of Micro Credit in Fisheries Sector)

মোঃ এহসানুল বারী
গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন

Abstract
Grameen Bank globally well known for its micro-credit activities without collateral for the landless poor specially women, stepped into aquaculture through the right of access to the landless and pondless poor of the northern of Pabna, Sirajgonj, Bogra, Dinajpur, Thakurgaon and Panchagar since 1986-88. It created a specialised organization named Grameen Motsho(Fisheries) Foundation in 1994 and handed over all activities of fisheries and aquaculture with participation of the landless poor community members. The farmers/ beneficiaries are trained in social development activities along with aquaculture. They are involved in fish culture to the extent of pond preparation, release of fry, management of pond, watching and guarding of ponds, harvesting and marketing of fish. They get a share of 50% of the production or the sale proceeds. Since 1991, they produced over 11,604 MT of fish in 430 ponds. They received over Tk. 143.83 millions as part of their 50% share of fish sales. By working only 2 hours a day, 4 days a week they earned over Tk. 5000.00 each on average a year from aquaculture alone from Govt. khas ponds. By doing so they have been able to alleviate their poverty. In this paper attempts have been made to demonstrate the importance of micro credit for the poor in elevating poverty through aquaculture in Govt. khas ponds with the help of Grameen Motsho & Pashusampad Foundation.

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণের একটি প্রায়োগিক প্রকল্প হিসাবে গ্রামীণ ব্যাংকের যাত্রা শুরু ১৯৭৬ সালে এবং এর পর ১৯৮৩ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বে সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র ঋণের দাবিদার এই বাংলাদেশ। ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ পরিবার সুবিধা ভোগ করছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র ঋণের বৃহৎ সফলতা তথা জাতীয় সফলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০০৫ সাল ঘোষিত হয়েছে জাতিসংঘ 'আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ' হিসাবে।

নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, পুকুর দীঘির দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উভয়ই মাছ চাষের জন্য উপযোগী। দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৪.৪ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর যা মোট জলাশয়ের প্রায় ৯১.১০ শতাংশ। বাকী প্রায় ৮.৮ শতাংশ বদ্ধ জলাশয়। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ২১.০২ লক্ষ মেট্রিক টন। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬৩ শতাংশ আসে মাছ থেকে। বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছ সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২৮ গ্রাম, যেখানে প্রয়োজন কমপক্ষে ৩৫ গ্রাম।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং নদ নদী, খালে বিলে মাছ উৎপাদন কমে যাওয়ায় জনগণ **"মাছে ভাতে বাঙালী"** প্রবাদটি ভুলতে বসেছে। পুকুরে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রযুক্তি ভিত্তিক মাছ চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মাছের সরবরাহ সাধারণ জনগণের নাগালের বাহিরে রয়েছে। অর্থাৎ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাণীজ প্রোটিন তথা মাছের ঘাটতি বেড়েই চলেছে। যদিও বাংলাদেশে পুকুর, জলাশয়, হাওর বাঁওড় ইত্যাদিতে মাছ উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ১৯৮৬-৮৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ ব্যাংক তথা গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশনের নিকট নিমগাছি মৎস্য চাষ প্রকল্প, সিরাজগঞ্জ, ২৫ বছর মেয়াদে প্রায় ৮০৮টি শতাব্দী প্রাচীন হাজামাজা পুকুর লীজ প্রদান করে । গ্রামীণ ব্যাংক পুকুর সংস্কার/পুনঃখনন করে স্থানীয় দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে একটি পৃথক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা শুরু করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার দিনাজপুর মৎস্য খামার, চকরিয়া চিংড়ি খামার, সাতক্ষীরা চিংড়ি কৌশল ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার এবং আরও পরে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ যমুনা

সেতুর এপ্রোচ রোড তৈরীর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের পুনর্বাসনের জন্য এপ্রোচ রোডের উভয় পাশের বরোপিট ২৫ বছর মেয়াদে গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তর করে। এছাড়াও পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চতুর্থ মৎস্য চাষ প্রকল্প, কমান্ড এরিয়া ডেভলপমেন্ট প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে দীর্ঘদিন ধরে যৌথভাবে মাছ চাষ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন পুকুরগুলিকে সংস্কার করে মাছ চাষ উপযোগী করে সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেছে। মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিটি সদস্যকে মাছ চাষ সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও নিয়মিতভাবে পাক্ষিক কেন্দ্র মিটিং এ মাছ চাষের সকল দিক নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। মূলতঃ মাছ চাষের যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্র হলো কেন্দ্র (গ্রাম সংগঠন)। প্রত্যেক সদস্যকে সাধারনত গড়ে এক বিঘা করে জলায়তন দেয়া হয়। পুকুরগুলোতে মাছ চাষের যাবতীয় উপকরন (Input) অর্থাৎ পোনা, খাদ্য, জৈব ও অজৈব সার, ঔষধ ও কেমিক্যালস সরবরাহ করে এবং সদস্যবৃন্দ এগুলোর প্রয়োগ, পাহারা এবং মাছ চাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহনসহ কায়িক শ্রম প্রদান করে। বিনিময়ে সদস্যগণ মোট উৎপাদনের ৫০% গ্রহণ করে। ফাউন্ডেশনের নিয়মানুযায়ী খামার কর্তৃক নিয়োগকৃত কেন্দ্র ব্যবস্থাপক/খামার সহকারীর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সদস্য/সদস্যগণ কর্তৃক মাছ ধরা, মাছ ওজন করা এবং বাজারজাতকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মাছ ধরার যাবতীয় পরিকল্পনা কেন্দ্রে বসেই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। সদস্যরা নিজেরাই মাছ বিক্রি করে সেদিনই ৫০% টাকা গ্রহণ করে থাকে।

মাছ চাষের মাধ্যমে সদস্যরা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে দেশে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন। শুধু তাই নয় ফাউন্ডেশানের হ্যাচারী থেকে রেণু সংগ্রহ করে নিজেরাই পোনা এবং ফিংগারলিং এর ব্যবসা করে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন এনেছেন। দেখাদেখি অনেক ব্যক্তি মালিকানাধীন / এজমালি পতিত পুকুর এখন চাষের আওতায় আসছে এবং মৎস্য উৎপাদন ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অনেক এনজিও এই পদ্ধতিতে অর্থাৎ দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে যৌথভাবে মাছ চাষ কর্মসূচী চালু করেছে।

জয়সাগর মৎস্য খামার ইতোমধ্যে পতিত ও অব্যবহৃত খাস পুকুরে মৎস্য চাষ করে একটি মডেলে পরিণত হয়েছে। খামারের ইতিবৃত্ত নিচের 'ছকে' দেয়া হলো

বছর ভিত্তিক চাষকৃত পুকুর এবং মাছ উৎপাদন, সদস্য সংখ্যা ও মাথা পিছু আয়ের তথ্য ঃ

অর্থ বছর	চাষকৃত পুকুরের সংখ্যা	জলায়তন (বিঘা)	মাছ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (টন)	প্রকৃত উৎপাদন (টন)	বিঘা প্রতি উৎপাদন (টন)	রেনু উৎপাদন (কেজি)	সদস্য সংখ্যা	মোট আয় (লক্ষ টাকা) (৫০% অংশ)	মাথা পিছু গড় আয় (টাকা)
১৯৮৬-৮৭	১৮৫	১৬৮২.৫০	১৬০	১৫৭.০০	৯৩.৩০	১৯৩.২১	উন্নয়নমূলক পর্যায়		
১৯৮৭-৮৮	৩০৬	২৫০৫.৫০	২৩৯	১৬০.০০	৬৪.০০	১২২.৯০	উন্নয়নমূলক পর্যায়		
১৯৮৮-৮৯	৩৫৬	২৯৮১.৪০	১৬০	১৭৩.০০	৫৪.০০	১৪২.৪০	উন্নয়নমূলক পর্যায়		
১৯৮৯-৯০	৩৪৭	২৯০৯.০০	৩৫০	২৩৭.০০	৮১.০০	১৯০.৯২			
১৯৯০-৯১	৩৮৮	৩০৮১.৮৪	৬০০	৪৫৬.০০	১৫১.০০	২৪০.৮০	২২৪৯	৩৮.২৩	১৭০০.০০
১৯৯১-৯২	৩৯২	২৮৬১.২৯	৬০০	৫০৩.০০	১৭৬.০০	২৭৯.৯৮	২৩০১	৪৬.০২	২০০০.০০
১৯৯২-৯৩	৩৯২	২৮৬১.২৯	৮০০	৮১০.০০	২৮৩.০০	৪২৫.৫৮	২১৬৫	৮৬.১৬	৩৯৮০.০০
১৯৯৩-৯৪	৩৯৬	২৮৮৫.০০	১০০০	৯৫৪.০০	৩৩০.০০	৫০৬.০০	২১৯৮	৭৮.৩৮	৩৫৬৫.০০
১৯৯৫	৩৯৬	২৮৮৫.০০	১০০০	৯৬৮.০০	৩৩৫.৫০	৬২৪.২৬	২২৪৭	১০৩.৩৮	৪৬০০.০০
১৯৯৬	৩৯৭	২৮৯০.০০	১০০০	৯৮৬.০০	৩৪১.০০	৬৩৩.০০	২২৪৭	৯৪.৪৩	৪২০০.০০
১৯৯৭	৪০৬	২৯৪০.০০	১০০০	৮৬৭.০০	২৯৫.০০	৫৫১.৫৫	২৩২২	৯৭.৫৯	৪২০০.০০
১৯৯৮	৪২১	৩০০০.০০	১০০০	৬২১.৬২	২০৭.০০	৫৬০.৪৮	২২৯৩	৮৫.৬০	৩৭৩৩.০০
১৯৯৯	৪২৩	৩০৬৯.৮২	১০০০	৮৪২.৬৫	২৭৫.০০	৫০৪.৩৫	২৫৪৮	১২১.২৯	৪৭৬০.০০
২০০০	৪২৭	৩১০৪.৩২	৯০০	৮৬৯.২০	২৮০.০০	৫৫২.৩৪	২৬২৮	১২৫.৩৭	৪৭৭০.০০
২০০১	৪২৭	৩১০৪.৩২	৯১০	৯০৭.৭৪	২৯২.৫০	৫৬৯.০৯	২৭২৪	১৩৭.৭৪	৫০৫৭.০০
২০০২	৪২৭	৩১০৪.৩২	১০০০	৯৮৭.০৭	৩১৮.০০	৬৪৫.৯৮	২৭৭৬	১৪৮.৫৫	৫৩৫১.০০
২০০৩	৪৩০	৩১১৮.০২	৯৬৫	৯৫০.১৩	৩০৪.৭০	৬১২.২৮	৩১২৮	১৪২.৩৩	৪৫৫০.০০
২০০৪	৪৩০	৩১১৮.০২	৯০০	৮৮১.৮৩	২৮২.৮০	৭০৯.৯৭	৩৮৫৫	১৩৩.২২	৩৪৫৫.০০
			১৩৫৮৪	১২৩৩১.২৪	-	৮০৬৫.০৯	-	১৪৩৮.২৯	

উল্লেখিত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৯০-৯১ সন থেকে দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বে পরিচালিত মৎস্য চাষ কার্যক্রম থেকে বিগত ১৪ বছরে মোট ১২,৬৭৫ টন মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১,৬০৪ টন মাছ উৎপাদন করেছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যা লক্ষ্যমাত্রার ৯২%, রেণু পোনা উৎপাদন করেছে ৭,৪১৫.৬৬ কেজি। সুবিধাভোগী সদস্যগন তাঁদের ৫০% অংশে ইতোমধ্যে পেয়েছেন ১৪৩৮.২৯ লক্ষ টাকা। গড়ে প্রতি সদস্য সর্বোচ্চ আয় করেছেন বার্ষিক ৫,৩৫১ টাকা শুধুমাত্র মৎস্য খাত থেকে । এজন্য তাঁরা কাজ করেছেন প্রতিদিন গড়ে ২ ঘন্টা করে সপ্তাহে ৪দিন। ২০০২ইং সনে তাঁরা গড়ে ঘন্টা প্রতি আয় করেছেন প্রায় ১৪.০০ টাকা। তদুপরি তাঁরা রেণু উৎপাদন করেছেন প্রায় ৭৪১৫ কেজি যার গড় মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

মৎস্য কর্মকান্ডের সাথে সাথে দরিদ্র সদস্যদের সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানি, আর্সেনিক দূষণ বিষয়সহ নারী সদস্যদের জন্য উন্নয়নে নারী, নারীর আইন ও অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত তাঁরা যা করেছেন তা হলো ঃ

(১) চাষাবাদের জন্য জমি ক্রয় করেছেন ৯৫.৪৭ একর। (২) বাড়ী নির্মাণের জমি ক্রয় করেছেন ২৫.৮৬ একর (৩) জমি বন্ধক নিয়েছেন ১৪৫.৭২ একর। (৪) টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন ২২২৭টি। (৫) গরু ক্রয় করেছেন ১১৫৭টি। (৬) ছাগল ক্রয় করেছেন ১৫৪২টি (৭) দোকান করেছেন ১৪৪টি (৮) হাওয়াই গাড়ী করেছেন ২৭টি (৯) রিক্সা/ভ্যান করেছেন ৩৫৪টি (১০) শ্যালো মেশিন / পাওয়ার টিলার করেছেন ৩৬৭টি (১১) টিউবয়েল স্থাপন করেছেন ২৫৭২টি (১২) স্যানিটারী ল্যাট্রিন করেছেন ১৭৩২টি (১৩) বায়োগ্যাস প্লান্ট করেছেন ২৩০টি। তাছাড়াও বৈদ্যুতিক আলো, রেডিও, টেলিভিশন নিয়েছে অনেকেই। বেশির ভাগই ইতোমধ্যে দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন (সূত্র ঃ বার্ষিক রিপোর্ট ঃ ২০০৪ইং, গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন)।

বর্তমানে বাংলাদেশে দীঘি পুকুর সহ যে সমস্ত জলাশয় রয়েছে মাছ চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত জলাশয় ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে এবং তাঁদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে এসে মাছ চাষে অর্থ যোগান দিতে পারলে মৎস্য সম্পদে স্বনির্ভর হতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মনে করি ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব।

গ্রামীণ ব্যাংক এবং গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন ছাড়াও দেশের বিভিন্ন এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মাছ চাষ বৃদ্ধি সহ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তি দরিদ্র মানুষের অধিকার। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ করে যদি সকল পতিত পুকুর,জলাশয় স্বল্প / দীর্ঘ মেয়াদে লীজ প্রদান করা যায় তবে সারা দেশে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। নারী পুরুষ এবং বেকার যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে এবং সর্বোপরি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রোটিন চাহিদা পূরণ হবে এবং দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। খাস পুকুরে ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে মৎস্য চাষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সুবিধাদি নিম্নে দেয়া হলো।

ক) সরকারের সুবিধাসমূহ

১) সরকারী সম্পদ অবৈধ দখল থেকে রক্ষা।
২) অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি ।
৩) দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বৃদ্ধি।
৪) সরকারের রাজস্ব আয় নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি।

খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুবিধাসমূহ

১) ভূমিহীনদের সরকারী সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্তি।
২) অব্যবহৃত / পতিত জলাশয়ের ব্যবহার করে তাঁদের অতিরিক্ত কাজের যোগান দেয়া।
৩) অতিরিক্ত আয় নিশ্চিত করা।
৪) গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করা ও ক্ষমতায়ন করা।
৫) আর্থিক দায় দায়িত্ব কম, কম পুঁজিতে উচ্চ লাভ।
৬) বঞ্চিতের বেদনা থেকে মুক্তি।

গ) প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) সুবিধাসমূহ

১) উচ্চ উৎপাদন ও দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করা।
২) কম কর্মী ও পারিশ্রমিক ব্যবহার করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা।
৩) অবৈধ মৎস্য শিকার বন্ধ করা।
৪) সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দারিদ্র্যতা বিমোচন করা।
৫) প্রতিষ্ঠানের সুনাম সৃষ্টি করে স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করা।

ঘ) স্থানীয় জনগনের সুবিধাসমূহ

১) ব্যক্তি মালিকানার পুকুর সমূহে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে উপকরন ও প্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি
২) মৎস্য, পোনা ও মৎস্য জাত দ্রব্যের বাজারজাত করনে সুযোগ গ্রহণ করা।
৩) বিভিন্ন রকম মৎস্যজাত খাদ্য ও শিল্প গড়ে তোলা।
৪) প্রকল্প এলাকায় গড়ে উঠা উন্নত রাস্তাঘাট ও বাজারসমূহের সুবিধা গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া।

বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন কৌশল অবলম্বন করছে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে উৎপাদিত মাছ ও আয়ের অর্থ আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য লাঘবে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বাস্তবায়নাধীন দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতে এ কর্মসূচী আরও কার্যকর করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা জরুরীভাবে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পতিত জলাশয় এনজিও এর মাধ্যমে লীজ প্রদান করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৎস্য চাষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা জরুরী। ক্ষুদ্র ঋণ সেবা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং আয় বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ব্যাপক বিস্তৃতি পেলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার যেমন ক্রমাগত উন্নতি ঘটবে তেমনি নারীর ক্ষমতায়নেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে ছোট মাছের ভূমিকা

(The Role of Small Indigenous Species (SIS) on Poverty Reduction and Nutritional Security)

ড. এম. নিয়ামুল নাসের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Poverty is not only defined by financial solvency but also with poorness in scholarly thought development, level of higher education, sound health and social structure. Fish, especially the small indigenous species (SIS) of Bangladesh are the sole contributor of nutrient to secure all above criteria.

Besides protein, human body needs various essential nutrients for growth and good livings. Omega-3 fatty acids is responsible for brain development, control some arthritis and diabetic, etc. Night blindness can be prevented by vitamin A. Micronutrients like, iron, calcium and phosphorous etc are responsible for blood (coping with anemia) and bone (reducing risks for osteoporosis) formation. Vegetable oils could be the source of some omega-3 fatty acids in diets. However, SIS of Bangladesh alone could supply more nutrients like protein, essential fatty acids, Vitamins and minerals in human diets than plants. The present paper reviews some available data on local fishes from our lab and others to foresee the benefit of SIS to the population.

ভূমিকা

জীবনধারণের জন্য আমাদের খাদ্য গ্রহণে অপরিহার্য্য উপাদান অনুযায়ী খাদ্য যে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে কিছু এমিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ এগুলো আমাদের শরীর সংশ্লেষিত পদ্ধতিতে তৈরি করতে পারেনা। মৎস্যজাত চর্বিতে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বেশি থাকে। খাদ্যে লৌহ কম থাকলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। এছাড়াও দেহে হিমগ্লোবিন, মায়াগ্লোবিন, ও সাইটোক্রম গঠনে লোহা মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ভিটামিন এ এর অভাবে চামড়া খসখসে হয়ে যায় ও রাতকানা রোগ দেখা দেয়। ভিটামিন ডি এর অভাবে শিশু 'রিকেট' রোগে আক্রান্ত হয়। বয়স্কদের হাড়ের বেদনা থেকে বাত সৃষ্টি হয়। হাড়ে ক্যালসিয়া শোষণে সাহায্য করে।

ছোট মাছ

হিমালয় পদভূমিতে সৃষ্টি, নদী বিধৌত বাংলাদেশের স্বাদুপানিতে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছ দেখা যায়। এর মধ্যে প্রায় ১৭০ প্রজাতি মাছ ছোট মাছ নামে পরিচিত। এদের আকার সর্বোচ্চ ২৫ সেঃ মিঃ হয়। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন ধরণের ছোট মাছ দেখা যায়। পুকুরে বা ছোট জলাশয়ে পুঁটি, টাকি, বাইম কিংবা বিলের মেনি, ফলি, মলা, টেংরা এমনকি নদীর রানি মাছ সবাই ছোট মাছ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে ছোট মাছের হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া(যেমন-পঁটকা, চ্যাপা, ইত্যাদি) সব মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় অনাদিকাল থেকে। মোট কথা, ছোট মাছ' মাছে-ভাতে বাঙালীর' আপামর জনগোষ্ঠির পুষ্টির উৎস আবহমান কাল থেকেই। নীচের সারণী-১ কয়েকটি ছোট ও বড় মাছের পুষ্টিমান দেখানো হলো-

সারণী-১ থেকে বুঝা যায় যে, বড় মাছ থেকে ছোট মাছগুলোর খাদ্যমান অনেক অনেক বেশি। অন্যভাবে বলতে হয় ছোট মাছগুলো অল্প খেলেই বড় মাছের কাছাকাছি কিংবা সমপরিমাণ খেলে বড় মাছের চেয়ে অনেক বেশী পুষ্টি পাওয়া যায়।ছোট মাছের এই পুষ্টি গুণাগুণ ছাড়া অন্যান্য গুণাবলীও আছে যা নিচে আলোচনা করা হলো।

খাদ্যপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে

	ভিটামিন এ (মিগ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিগ্রাম)	লৌহ (মিগ্রাম)
ছোট মাছ			
মলা	১৯৬০	১০৭১	৭
চেলা	৯৩৭	১২৬০	-
ভারকিনা	১৪৫৭	৫৯০	১.৯৬
চান্দা	৩৪১	১১৬২	-
পুঁটি	৩৭	১০৫৯	-
কৈচকি	৯৩	-	-
বড় মাছ			
ইলিশ	৬৯	১২৬	৩
সিলভার কার্প	১৭	২৬৮	-
রুই	২৭	৩১৭	-
তিলাপিয়া	১৯	-	৫

সারণী-২. আরও কয়েকটি মাছের পুষ্টিমান ও ফ্যাটি এসিড (Fatty acids)

খাদ্যপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে (%)							
						অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	
	আমিষ	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	আয়রন	চর্বি	মাথায়	শরীর
সরপুঁটি	১৬.৫	২২০	১২০	০.৫৪	৯.৫	২৬.৪	৫৪.৫
মলা	-	সা:১	-	সা:১	-	৩২.৮	২৭.০
পুঁটি	১৮.১	সা:১	-	সা:১	২.৪	৩৪.৫	৬৫.০
ডারকিনা	১৪.৬	৫৯০	৩৪০	১.৯৬	১৪.৩	-	-
কৈ	১৪.৮	৪১০	৩৯০	১৩৫	৮.৮	-	-
বাটা	১৪.৩	৭৯	২০০	১.০৯	২.৪৮	-	-
ফলি	১৯.৮	৫৯০	৪৫০	১৬৯	১.০	-	-
টাকি	১৯.৪	৬১০	৫৩.	১৩০	০.৬	-	-
বেলে	১৪.৫	৩৭০	৩৩০	১০৪	০.৬	-	-
শিং	২২.৮	৬৭০	৬৫০	২২৬	০.৬	-	-

মাছের তেল

এস্কিমোদের খুব কমই হৃদরোগ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে এরা মাছ ও মাছ জাতীয় খাদ্য বেশী খায় ফলে তাদের রক্তে ওমেগা-তিন ও ছয় জাতীয় ফ্যাটি এ্যাসিডেরে প্রাচুর্য রয়েছে। যা মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য সহায় বলে ধরা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠিতে যেখানে হৃদরোগের হার বেশি দেখা যায় সেখানে প্রাণিজ চর্বি ও দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য থেকে ফ্যাটি এ্যাসিড ও লিপিড মানুষ গ্রহণ করে। ফলে কোলেসটেরল ও অন্যান্য ক্ষতিকারক লিপিড এর মান বিপদজনক মাত্রায় পৌছে যায় ও রক্ত নালীতে বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি করে। এমন কি 'নিরামিষভোজী' (Vegeterian) দের মাঝেও হৃদরোগের সংখ্যা বেশি দেখা যায়, যখন তারা খাবারের সাথে ঘি, মাগন, পনির ও ছানা বেশি বেশি খেয়ে থাকে। অর্থাৎ মাছের তেল আমাদের জন্য উপকারী।

বাত ব্যথায়

বিভিন্ন ধরণের বাত (Artherities) দেখা যায়। এর মাঝে কিছু বাত আছে তারা শরীরের রোগ পতিরোধে (Resistance) বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। এদের Autoimmune বাত রোগ বলে। এই রোগের ব্যাথার কারণ হলো প্রস্টোগ্লাণ্ডলিন নামে এক ধরণের হরমন। রোগের পথ্য হিসেবে এসপিরিন দেয়া হয়। এসপিরিন শরীরের এন-৬, ২০ কার্বন জাতীয় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসডিগুলিএসপিরিনের মতই প্রোষ্টগ্লাণ্ডলিন উৎপাদন বন্ধ করে বাতের জ্বালা যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেয়। প্রাথমিকভাবে আমরা গবেষণায় দেশীয় ছোট মাছগুলিতে এন-৩, ২০ কার্বনের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। যা হয়তা অনাদিকাল থেকে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া বসবাসকারী এই বিপুল জনগোষ্ঠিকে তাদের ছোট মাছ খাবার কারনে অজান্তেই উপকার করে আসছে।

ডায়াবেটিক রোগ

ইনসুলিন উৎপন্নের মাধ্যমে আমরা শরীর মেটালিজম নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণের সমস্যা হলেই ডায়াবেটিস হয়। আমেরিকার ওহাইয়ো বিশ্ববিদ্যালয় এক গবেষণায়, ১২ জন সুস্থ ভলানটিয়রকে মাংসজ, সজীজাত ও মাছ জাতীয় খাবার তেল দুই সপ্তাহ খাইয়ে দেখা যায় যে শুধুমাত্র মাংসভোজী ভানটিয়রদের ইনসুলিন ক্ষরণের হার অন্যদের থেকে বেশি। এছাড়া আরও দেখা যায়, মাছের তেল শুধুমাত্র ইনসুলিনের ক্ষরনে সাহায্য করে না, এরা ইনসুলিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

বুদ্ধি বিকাশ

বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর অনেক জাতি থেকে কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। আমরা হয়ত অনেকেই জানিনা যে আমাদের মস্তিষ্ক ৬০% উপাদানই হলো লিপিড। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই কারণে আমাদের মস্তিস্কের গঠন ও সবচেয়ে জটিল। যার বিকাশে লিপিডের প্রয়োজন আছে। চোখের রেটিনায় পাওয়া যায় এমনই ২০ ও ২২ কার্বন অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের উপস্থিতি মস্তিষ্কে লক্ষ্য করার মতন। মায়ের গর্ভে শিশুর মস্তিস্কের বিকাশ, মেধা চর্চায় ও সুস্থ মানসিকতায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের প্রয়োজনীয়তা এখন স্বীকৃত। উন্নত বিশ্বে প্রচলিত আছে যে, কেউ একদিন মাছ খেলে পরের সাতদিনে ৩০% কম বিষন্নতায় (Despression) ভোগে।

মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টস

ক্যালসিয়াম, পেশী সংকোচন, স্নায়ুর উদ্দীপনার জন্য এক স্নায়ুকোষ থেকে অন্য কোষে সঞ্চালন, দাঁত ও অস্থিগঠনে মূলত সাহায্য করে। একইভাবে ফসফরাস, ক্যালসিয়ামের সাথে যৌগ গঠন করে, খাদ্য থেকে শক্তি স্থানান্তর, DNA, RNA ও ATP গঠনে সাহায্য করে। ছোট মাছের মাধ্যমে এই প্রয়োজন মেটান যায়।

শেষ কথা

এদেশের বাতাস, মাটি, গাছপালা, প্রাণিকুল ও পানি সব মিলিয়েই আমাদের পরিবেশ। এই পরিবেশে বেঁচে থাকতে আমাদের আশেপাশের সবকিছুই ব্যবহার করা আমাদের প্রয়োজন। মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণি একে অন্যের সম্পূরক। আমাদের মৎস্য সম্পদ তথা মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যকুল আজ বিপন্ন পরিবেশে মুক্ত জলাশয়ের, তথা খাল, বিল ও নদী নালায় আজ আমরা বিভিন্ন প্রকারের মাছের সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার করতঃ জেলে সম্প্রদায় ও সমগ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানো সম্ভব।

মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরে জেলেরা তাদের জীবীকা নির্বাহ করে থাকে। মাছ আমাদের তথা সমগ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি যোগায়। মস্তিষ্ক বিকাশ, বহুমুত্র রোগ বা বাতের ব্যাথায় উপসম হিসেবে মাছজনিত ফ্যাটি এসিডের প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্যতার সংগা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সচ্ছলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ও সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার বিকাশের মধ্যেও দারিদ্র্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। সঠিক পরিমানে মাছ খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করলে আমরা অর্থনৈতিক সামাজিক ও মেধা বিকাশের দারিদ্র্যতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব।

বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানীর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

(Present Status and Future Prospects of Export of Frozen Shrimps and Fish of Bangladesh)

মাকসুদুর রহমান এম বি এ
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড্‌স এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

Abstract

Bangladesh is blessed with vast fisheries resources due to favorable climatic condition and geographical location of the country. This sector contributes a lot in foreign currency earnings, poverty eleviation, employment generation and supply of animal protein. Because of high demand of fish and fisheries products both in national and international market, the dynamism is observed in field of production in recent years. Besides, due to open competition, this sector is facing new challenges. Export of frozen foods rank second in the national export basket. Like other SMEs in Bangladesh, the engine of growth in the frozen foods sector is also the private sector. Most of the sponsors of the industries are either first generation investors or new comers with modest capital. The present government extended help and cooperations manifolds including 10% cash incentive, reducing interest rate etc. to retain continuous growth of exports of this sector. The exporters are investing more to produce value added products instead of traditional block products to meet the demands of the global market.

The global fishery markets have expanded from East to West and from North to South over the years. Bangladesh could earn double and triple in a year if concerted efforts are taken in the light of "VISION-2010 and beyond" submitted by Bangladesh Frozen Foods Exporters Association.

মৎস্য সম্পদের অফুরন্ত ভান্ডার আমাদের বাংলাদেশ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ু আবহমানকাল হতেই মৎস্য সম্পদের অনুকূলে। দেশবাসীর আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান, বিপুল বেকার ও দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য সম্পদ অনন্য অবদান রেখে আসছে। আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীন বাজারে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য গতি এসেছে। পাশাপাশি মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার পরিবেশে দেশের মৎস্য রপ্তানী বাণিজ্যকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

এ দেশের মৎস্য রপ্তানী শুরু হয় তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে অত্যন্ত সীমিতভাবে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে (১৯৭২-৭৩ সালে) এই খাতে রপ্তানী আয় ছিল মাত্র ২.৭৮ কোটি টাকা। বেসরকারী উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা, সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে মৎস্য খাত আজ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানী খাত হিসেবে পরিগণিত।

বিগত ১০ বছরের মৎস্য রপ্তানী পরিসংখ্যান ঃ

বৎসর	পরিমাণ (মিলিয়ন পাউন্ড)	মূল্য (মিলিয়ন ডলার)
১৯৯৫-৯৬	৭৫.০৭	৩১৩.৬৯
১৯৯৬-৯৭	৭৬.০৫	৩২০.৭৩
১৯৯৭-৯৮	৬০.৮৫	২৯৩.৮৪
১৯৯৮-৯৯	৫৮.৩৫	২৭০.৩২
১৯৯৯-০০	৭৪.২৩	৩৪৩.৮২
২০০০-০১	৭৬.৭০	৩৬৩.২৩
২০০১-০২	৮৮.৩৬	২৭৬.১১
২০০২-০৩	৭৩.৫৭	৩২১.৮১
২০০৩-০৪	৮৪.৪৮	৩৯০.২৫
২০০৪-০৫ (জুলাই-মে=১১ মাস)	৮৭.১৫	৩৮৩.৩২

(সূত্র ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)

বর্তমানে সরকার অনুমোদিত প্রায় ৬০টি হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানা চিংড়ি ও মাছ রপ্তানীতে নিয়োজিত। এগুলোর মধ্যে ৫৮টি কারখানা ইউরোপে হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানীর জন্য অনুমোদিত। তবে বন্ধ কারখানাসহ বর্তমানে দেশে প্রায় ১৩০টি হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানা রয়েছে। প্রায় ৪০টি

দেশে বাংলাদেশ হতে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানী হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) আমাদের হিমায়িত চিংড়ির প্রধান ক্রেতা রাষ্ট্র। দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হয়ে থাকে। এছাড়া যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইতালী, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জাপান, কানাডা, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমান হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানী হয়।

বাংলাদেশের উৎপাদিত হিমায়িত চিংড়ির সেরা দশটি আমদানীকারক দেশ

	মূল্য (ডলার)	মূল্য (ডলার)
	২০০৩-০৪	২০০২-০৩
যুক্তরাষ্ট্র	১২৭৩৫৮	৭৭১৩৪
বেলজিয়াম	৯৪২৪১	৭৫৪৭১
যুক্তরাজ্য	৮০১৮৮	৮২৭০৪
জার্মানী	২২৫২৮	২৪৭১৫
জাপান	১৯৬২৪	১৪৮৬৪
ফ্রান্স	৪৮২৫	৫৪৬৮
ডেনমার্ক	৩৪৭৫	১৬৫৪
ভিয়েতনাম	২০৩৫	৩৬৫
রাশিয়া	১৭৩৭	৩০৮
ইতালী	১০৪০	৮২৯

(সূত্র ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)

(মূল্য ঃ হাজার ডলার)

বাংলাদেশে উৎপাদিত মাছের সেরা দশটি আমদানীকারক দেশ

	মূল্য (ডলার)	মূল্য (ডলার)
	২০০৩-০৪	২০০২-০৩
যুক্তরাজ্য	১০৩৬৯	১০৬১৯
ভারত	৫০১৩	২৭২৫
সৌদি আরব	২৭৭৭	৩৩৬৬
যুক্তরাষ্ট্র	২৬৭৬	১৯৬৪
হংকং	১১৪৫	৮৪৯
চীন	১১১৫	৫৩২
কুয়েত	৭৩২	৬২৫
থাইল্যান্ড	৭০৬	৮৯৪
কানাডা	৭০০	৮০৪
দঃ কোরিয়া	৩৮১	৭০

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্য রপ্তানীর আন্তর্জাতিক বাজার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮২ সালে মৎস্যপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার ছিল ১৭.৯৪ বিলিয়ন ডলার, যা ২০০২ সালে ৬১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। বিশ্বে ফার্মড মৎস্যপণ্য উৎপাদনে এশিয়ার দেশগুলো নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। মৎস্যপণ্য সমূহের মধ্যে চিংড়ি উৎপাদন ও মূল্যে আন্তর্জাতিক বাজারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের রপ্তানীকৃত হিমায়িত খাদ্যের মধ্যে চিংড়ির অবদান প্রায় ৯২%। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া এখন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিক পর্যায়েও বাংলাদেশ হতে ব্যাপক চিংড়ি রপ্তানি হচ্ছে। বিশেষ করে জাপান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, চীন ইত্যাদি দেশে বাংলাদেশ হতে চিংড়ি রপ্তানী হয়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রধান চিংড়ি রপ্তানীকারক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ হতে চিংড়ি ক্রয় করে এ সকল দেশ মূল্য সংযোজিত করে তা পুনঃরপ্তানি করে থাকে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ির ডলারে মূল্যের পরিমান ঃ

দেশ	মূল্য (ডলার)	মূল্য (ডলার)
	২০০৩-২০০৪	২০০২-২০০৩
জাপান	১৯৬২৪০০০	১৪৮৬৪০০০
ভিয়েতনাম	২০৩৫০০০	৩৬৫০০০
থাইল্যান্ড	৯৪৩০০০	৫০২২০০০
হংকং	৯১৭০০০	৫৯০০০
চীন	৬০৯০০০	১১২০০০
মালয়েশিয়া	৫৫১০০০	১১৭০০০
পাকিস্তান	১৭১০০০	
দক্ষিণ কোরিয়া	৫৩০০০	২০০০০
ভারত	৩৮০০০	২৭২০০০

(সূত্র ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো)

বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও জাপানে মূল্য সংযোজিত হিমায়িত খাদ্যপণ্য (Ready to Eat) অধিক রপ্তানী হয়ে থাকে। বিগত পাঁচ বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য সংযোজিত হিমায়িত খাদ্যপণ্যের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ভোক্তাদের চাহিদার কারণে দেশের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে সচেষ্ট রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৫০% হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারী কারখানা মূল্য সংযোজিত পণ্য রপ্তানিতে নিয়োজিত রয়েছে। রপ্তানিকারক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার কারণে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করে প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ১০% নগদ সহায়তাসহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। ফলে চিংড়ি ও মাছ উৎপাদন এবং রপ্তানী উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হতে হিমায়িত চিংড়ি ও মাছের রপ্তানী উৎসাহিত করার জন্য ১০% নগদ সহায়তা প্রদান করায় বিগত তিন বছরে হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ উৎপাদন ও রপ্তানী রেকর্ড পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী প্রতিষ্ঠানকে ঋণের বিপরীতে ৭% সুদে ঋন প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। কৃষিভিত্তিক রপ্তানীখাত হিসেবে হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানাগুলোর বিদ্যুৎ বিলের ৩০% রিবেট প্রদান করা হলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে, যা আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজারে পণ্যের দরকষাকষির সুযোগ সৃষ্টি করবে।

বিগত কয়েক বছরের চিংড়ি উৎপাদন অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশ এখন বাগদা চিংড়ির পোণা

উৎপাদনে শুধু স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, বরং পোণা রপ্তানী করাও এখন সম্ভব। কিন্তু দেশে সনাতনী প্রথায় চিংড়ি চাষ হয় বলে চিংড়ি চাষীরা উৎপাদনে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে উৎপাদিত বাগদা পোণার বিপরীতে যদি চিংড়ি উৎপাদন সুনিশ্চিত করা যেতো, তাহলে রপ্তানী আয় দ্বিগুণ/তিনগুণ বৃদ্ধি পেতো। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিভিন্ন জেলার প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। আশার কথা এই যে, বিগত তিন বছরে দেশের বিভিন্ন জেলায় গলদা চিংড়ি চাষের এক নীরব বিপ্লব সূচিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, হ্যাচারী নির্মান, পরামর্শ দান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, চিংড়ির আহরনোত্তর গুণগত মান সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের কারণে চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা যথা কারিতাস, ডানিডা, ব্রাক, এটিডিপি-২ প্রভৃতি গলদা ও বাগদা চিংড়ি উৎপাদনে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করছে।

বাংলাদেশের প্রচলিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে অনেকাংশে জৈব পদ্ধতি অনুসরণ হয়ে থাকে। তথাপিও দেশে জৈব চিংড়ি (Organic Shrimp) উৎপাদনের জন্য সুইজারল্যান্ড সরকারের Swiss Import Promotion Programme (SIPPO)-এর সহযোগিতায় বিএফএফইএ-এর উদ্যোগে সাতক্ষীরা জেলায় একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীকারী কারখানা, একটি চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র এবং একটি এনজিও-এর মাধ্যমে চিংড়ি চাষাঞ্চলে জৈব চিংড়ি উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চলতি বছরেই এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হবে। জৈব চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানী শুরু হলে বাংলাদেশের চিংড়ির সুনাম ও মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

হিমায়িত চিংড়ি ও মাছের রপ্তানী বাজারের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বিদেশী সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা এখানে প্রণিধানযোগ্য। ঢাকাস্থ ইউরোপীয়ান কমিশন-এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিদেশে বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ির বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প সহায়তা পেয়েছে এ দেশের চিংড়ি রপ্তানীকারকগণ। এছাড়া সুইজারল্যান্ড সরকারের SIPPO কর্তৃক বিগত দু বছরে বেলজিয়ামের রাজধানী Brussels-এ অনুষ্ঠিত European Seafood Exposition (ESE)-এ বাংলাদেশের প্যাভেলিয়নটি অত্যন্ত আকর্ষনীয়ভাবে সাজানো হয়েছে। ফলে মেলায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং মেলায় আগত হাজার হাজার দর্শকদের আকর্ষন সৃষ্টি করেছে। দেশের চিংড়ি শিল্প উন্নয়নে বিএফএফইএ-এর সাথে ভিয়েতনাম, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের পৃথক পৃথক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। বিভিন্ন দেশের চিংড়ি উৎপাদন প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণে বিএফএফইএ-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় অদূর ভবিষ্যতে দেশের হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্য রপ্তানীতে একটি ইতিবাচক ফলাফল আশা করা যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২৪.৪৫ লক্ষ মেঃ টন নির্ধারন করা হয়েছে। বিগত দশকে মাছের গড় প্রবৃদ্ধি ৬-৮%-এর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। সরকার মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে তথা গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অধিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের জন্য অধিক অর্থ বিনিয়োগ করছেন। সরকার কৃষিভিত্তিক মৎস্যখাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় এই খাতের সহযোগী হিসেবে মৎস্যখাদ্য, যন্ত্রপাতি, প্যাকেজিং, পরিবহনসহ বেশ কিছু উপ-খাতের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দেশে মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি শিক্ষিত শ্রেণীর সম্পৃক্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মৎস্য সেক্টরকে দেশের এক নম্বর রপ্তানী খাত হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড্স এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন বছরে দশ হাজার কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যে VISION-2010 and Beyond নামে একটি কর্ম পরিকল্পনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট উপস্থাপন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এই কর্ম পরিকল্পনাটি রপ্তানী সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিতে এজেন্ডাভুক্ত করা হয়েছে। মৎস্য শিল্পে পরিবেশ সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা, মানবাধিকার, শোভন শ্রম নিরাপত্তা, শ্রেয় ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, সনাক্তকরণ (Traceability) এবং সার্টিফিকেশনকে মূল ভিত্তি করে VISION-2010 and Beyond-এর কার্যক্রম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে অচিরেই শুরু হতে যাচ্ছে। রপ্তানী বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের পাশাপাশি অফুরন্ত সম্ভাবনাময় হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী শিল্প দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে দেশ বিদেশের অভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

মাৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ
(Participation of Women in Fisheries Development)

আনোয়ারা বেগম শেলী পিএইচ.ডি
মার্সেল ডি' কস্তা
কারিতাস

Abstract

Women are now playing a significant role in fisheries development for their employment income generation, nutrition and empowerment. They are not only involved in small scale aquaculture, but also managing large water bodies as well as public water bodies in terms of awareness raising, production enhancement, and conservation. Go-NGOs who are working for fisheries development have some specific strategies for women involvement & empowerment in aquaculture. About 40-50% women are involved in fisheries sector are often limited by social, cultural and religious norms, due to illiteracy, weak & shy in expression, seclusion & segregation. Even investment f earnings in purchasing any property by the name of women is still thwarted. Specific project on women in fisheries, women interventions obeying social & capacity building, availability of inputs for aquaculture could prompt their activities. The paper illustrates the status and potential role of women in fisheries development.

ভূমিকা

মাছচাষ এবং মাৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ভূমিকায় নারীরা আজ প্রশংসনীয় পযার্য়ে স্বমহিমায় উজ্জল। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য হিসাবে বসতবাড়ী সংলগ্ন বা কাছাকাছি পুকুর, দীঘি, খাল বা জলাশয় থাকে। আর এ পুকুর-দীঘির কথা বলতে গেলে প্রথমে যে চিরাচরিত দৃশ্যটি মানসপটে ভেসে উঠে তা হল নারী-জলাশয় সম্পর্ক। প্রতিদিন গৃহস্থালী কাজে, ধোয়া-মোছায় ও রান্না-বান্নার কাজে, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ নানাবিধ পারিবারিক কাজে পুকুর তথা জলাশয়ের সাথে গ্রামীণ নারীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কাজেই পুকুর, দীঘিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে নারী প্রসঙ্গটি চলেই আসে, যেখানে নারীরা অনায়াসে দৈনন্দিন গৃহস্থলী কাজের পাশাপাশি মাছচাষ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।

পুকুর, দিঘী ছাড়াও জলজ সম্পদে ভরপুর ডেল্টয়িক বাংলাদেশের অন্যান্য জলাশয়, যেমনঃ খাল, বিল, নদী, নালা, হাওর, বাওড় এবং পাহাড়ী ঝর্ণা, খাঁড়ি প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে মৎস্য ব্যবস্থাপনার আওতায় চলে আসছে। আর পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও এ সকল জলজ সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পুকুর খনন, পুনঃখনন, সংস্কার, পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ, বিক্রয়যোগ্য মাছ উৎপাদন, সমন্বিত চাষ, পোনা চাষ, মাছ ধরার ও বিপণনের উপকরণাদী তৈরী, মাছ আহরণ, বাছাই, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর সংশ্লিষ্টতা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও মৎস্য

আইন বাস্তবায়ন ও মেনে চলতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাছচাষে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে নারীরা তাদের পরিবারের আয়ের উৎস বাড়াতে পারে, পুষ্টির অভাব পূরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ নারী মাছচাষসহ মাৎস্য সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক অন্যান্য কাজে জড়িত। সর্বোপরি জাতীয়ভাবে মাৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহন ও ভূমিকা যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

মাৎস্য কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

পুকুর, দীঘি, পাহাড়ী ঝর্ণা, ক্ষুদ্র জলাশয়ে উন্নত লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্পজাতীয় মাছের সমন্বিত চাষ, পোনা উৎপাদন, চিংড়ি চাষ, ধান ক্ষেতে মাছচাষ, লালমাটির পুকুরে মাছ চাষ, কাঁকড়া চাষ, মাছের খাদ্য উৎপাদন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীরা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। উদাহরণ হিসাবে সরকারের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পাধীন সকল ক্ষেত্রে নারী সম্পৃক্ততা গড়ে ২৫%। ইফাদ (IFAD) ফরিদপুর প্রকল্পের উপকারভোগীদের ৯৬% নারী। পিবিএইপি-এর সুফলভোগীর ৫১,৫৮৬ টি মাছচাষী পরিবারের মধ্যে ৫০% নারী সমন্বিত মাছচাষে প্রশিক্ষণ পেয়ে মাছচাষ করছে; কার্পজাতীয় মাছ ও চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরীর ওপর প্রশিক্ষণ পেয়ে ৬৫ জন নারী একে সফল পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। জিএনএইপি'র মাছচাষে জড়িত ৩৫,০৬৪ জনের মধ্যে ১৭,০৮১ জন অর্থাৎ ৫০% নারী। দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের উপকারভোগীদের ৪০% নারী। উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম নামে আরেকটি সরকারী প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ ৫-৬%। কারিতাসের আওতাধীনে ক্ষুদ্র জলাশয়, পুকুরে মাছচাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পৃক্ত রয়েছে ৫৩% নারী, যাদের সংখ্যা লক্ষাধিক। গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের যমুনা বরোপিট মৎস্যচাষ প্রকল্পের সরাসরি সুফলভোগীর ১০০% নারী। ব্র্যাকের আওতাধীন প্রায় ১০৯,০০২ জন মৎস্য চাষে জড়িত যার ৯০% নারী। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যে সব প্রকল্পে বা কর্মকান্ডে দাতা সংস্থা নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে শর্ত জুড়ে দেয় বা শর্ত আরোপিত থাকে সে সব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেশি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলিতে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন সংস্থায় প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অংশগ্রহণ করে নারীরা তাদের ভূমিকাকে আরও উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে।

পুকুর, ডোবা, ক্ষুদ্র জলাশয়ে নারীদের কাজ

মাছচাষ সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল ক্ষেত্রে নারীর পদচারণা ও কাজ সুচিহ্নিত রয়েছে। যে সব কাজগুলো তারা সহজেই করতে পারে তার মধ্যে - পুকুর পুনঃখনন, পুনঃসংস্কার, প্রস্তুতি, ক্ষুদ্র আকারে হ্যাচারী পরিচালনা, মাছের খাদ্য তৈরী, মাছের নার্সারী, মাছের মিশ্র ও একক চাষ, সমন্বিত মাছচাষ, পুকুরে নিয়মিত পোনা মাছ মজুদকরণ, চুন-সার প্রয়োগ, মৌসুমি মাছ ধরা, গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-গাছ-সবজী-ফলমূল-মাছের সমন্বিত খামার তৈরি, চিংড়ির ঘের তৈরি ও চাষ, কাঁকড়া ে মোটাতাজাকরণ, মাছ প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজে নারীরা যথেষ্ট পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

মাছ আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নারীর অংশগ্রহন

উপকূলীয় এলাকা, বড় বড় নদী, হাওর-বাঁওড়, বিল পাড়ে বসবাসরত নারীদের এক বিরাট অংশ মৎস্য আহরণ বিষয়ক সামগ্রী তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ, আহরিত মাছ বিক্রি ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও উপকূলীয় এলাকায় নদী, খাল, পুকুর ও চিংড়ি ঘের প্রস্তুতি, পোনা আহরণ, মাছে বরফ দেয়া এবং মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণে নারীর ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিংড়ি ডিপো ও ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকের অধিকাংশই নারী।

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ

ক্ষুদ্র জলাশয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি নারীরা বিল, হাওর, বাঁওড় ও প্লাবনভূমিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মাছ ধরার চাপ কমানো এবং লাগসই ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। অভয়াশ্রম স্থাপন ও ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ, কারেন্ট জাল ব্যবহার থেকে বিরত থাকা, জলাশয় সংলগ্ন আবাদি জমিতে কীট নাশক ব্যবহারের কুফল এবং মৎস্য আইন মেনে চলতে পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করে নারীরা রাখছে কার্যকর ভূমিকা।

তাছাড়া বসতভিটা ও জলাশয় সংলগ্ন আবাদি জমিতে সমন্বিত ও পর্যায়ক্রমিক শস্যচাষে সক্রিয় অংশগ্রহণ, মাছ ধরার প্রয়োজনীয় উপকরণ- জাল, খালই, বানা, বরশি, চাটাই তৈরি এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে পুরুষদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা কম নয়। এক্ষেত্রে

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন মাচ প্রকল্পের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। উক্ত প্রকল্পে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন (আরএমও) ও সম্পদ ব্যবহারকারী সংগঠনে

(এফআরইউজি) নারীদের অংশগ্রহণ জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করেছে। এ প্রকল্পে জড়িত উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৩% নারী। নারী সদস্যরা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এ যাবত প্রায় ৩ কোটি টাকা বিভিন্ন আয়মূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যবহার করে আসছে। সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (সিবিএফএম) প্রকল্পে ৩০% নারী মাৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে। বাঁচতে শেখা কর্তৃক সংগঠিত নারীরা সিবিএফএম প্রকল্পের আওতায় একটি বিল ব্যবস্থাপনায় সাফল্য লাভ করেছে যেখানে উপকারভোগীদের সকলেই নারী।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ এবং গুরুত্ব

মাছচাষ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনেকদিনের হলেও সম্প্রতি বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কালের প্রবাহে এক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। মাৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায়, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী নেতৃত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নারীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । এর ফলে, গৃহসংলগ্ন পতিত পুকুর, দিঘী, ডোবা মাছ চাষের আওতায় এসেছে, পুকুরে প্রতি শতাংশে মাছের বার্ষিক উৎপাদন ২৫-৩০ কেজি পর্যন্ত বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, ফলে পরিবেশ উন্নয়নের সাথে উৎপাদন খরচও কমেছে; মাছচাষের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক ও পুষ্টির যোগান দেয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, প্রতিবেশী নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে এবং মৎস্যচাষ প্রযুক্তির যথাযথ সম্প্রসারণ হচ্ছে, বাড়ীঘরের পরিবর্তন, আসবাবপত্র ক্রয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ জীবনমান উন্নত হয়েছে; ছেলেমেয়েদের শিক্ষা খরচ, পোষাক, পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খুবই সহায়ক; সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠন, উন্নয়ন কাজে ঋণ গ্রহণ, ব্যবহার ও ফেরত দানের সামর্থ অর্জন করেছে ও নিজেদের কাজ নিজেরা পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জনসহ নেতৃত্ব গঠন এবং নারী মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সম্পদবৃদ্ধি, মৎস্য আইন বাস্তবায়নে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। যেমন: ডিমওয়ালা বা পোনা মাছ না ধরা, ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা, কারেন্ট জাল ব্যবহার না করা; মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, জলাভূমি সংলগ্ন অঞ্চলে খাদ্য-শস্য উৎপাদনে কীট-নাশক ব্যবহার থেকে বিরত থাকা, প্রয়োজন মত বিলুপ্ত প্রায় দেশী প্রজাতি মাছের অবমুক্তকরণ এবং এর উৎপাদন বাড়ান, নিয়মমত মাছ ধরা, ধৃত মাছ স্বাস্থ্য সম্মতভাবে প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।

চিহ্নিত সমস্যা/ প্রতিবন্ধকতা

মাৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে তবুও এ কাজে নারীরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মাছচাষ থেকে অর্জিত অর্থ পরিবারের বিভিন্ন কাজে (খাদ্য ক্রয়, ছেলে মেয়ের লেখাপড়া, ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আর্থিক খাতে) খরচ হলেও নারীদের নিজের নামে কোন স্থায়ী সম্পদ করণে, জমি ক্রয়ে কিংবা নিজের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী এখনও তারা আয়কৃত অর্থ খরচ করতে পারে না, নারীকে দৈহিকভাবে দূর্বল আখ্যা দিয়ে শ্রমের ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করা হয়, গ্রামীণ নারীরা শিক্ষায় অনগ্রসর, ফলে তারা কোন জনসমাবেশে বা মিটিং এ অভিব্যক্তি প্রকাশ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সাংগঠনিক কর্মকান্ডে নারীদের উপস্থিতি বেশ উল্লেখযোগ্য (৩০-৫০%), কিন্তু তারা পুরুষদের সামনে কোন প্রস্তাব তুলে ধরতে ইতস্ততঃ বোধ করে কিংবা তাদের মতামত খুব কমই প্রতিফলিত/গৃহিত হয়, রক্ষণশীলতা ও ধর্মান্ধতাও অনেকক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে দেখা দেয়, জলাশয় ইজারার ক্ষেত্রে পুরুষদেরকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, সরকারি ব্যাংক থেকে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ঋণ

নেয়ার সুযোগ কম, মাছচাষের জন্য পোনা মাছ, মাছের খাদ্য, সার ও ঔষধ-পত্র ইত্যাদির প্রচলিত ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থায় নারীদের সরাসরি অংশ নেয়ার সুযোগ কম, দেশের বেশির ভাগ এলাকায় মাছ বাজারজাত করতে নারীদেরকে পুরুষের ওপর নির্ভর করার ফলে লভ্যাংশ বেহাত হয়, মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নারী কর্মীর অভাব, জাতীয় পর্যায়ে মৎস্য বিষয়ে নারীদের অধিকহারে সম্পৃক্ত করণের পৃথক সম্প্রসারণ কৌশল, নীতির অভাব ইত্যাদি।

সমস্যা উত্তোরণের উপায়

মাৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বদ্ধ জলাশয় থেকে উন্মুক্ত জলাশয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তারা নিজেরাই কিছু সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করে। সমস্যা উত্তোরণের জন্য নারীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা, খাস, পতিত, আবাদী বা অনাবাদী জলাশয়ের লীজ প্রদানে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া, মাছচাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রাপ্তি ও বিতরণের ব্যবস্থা নারীদের জন্য সহজলভ্য করা, সকল প্রকল্পে নারীদের জন্য পৃথক বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করা, জাতীয় পর্যায়ে নারীদের জন্য পৃথক সম্প্রসারণ কৌশল এবং নীতিমালা প্রণয়ণ ও কার্যকর করা প্রভৃতি ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

উপসংহার

সমাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে, রাজনীতিতে, নেতৃত্বে, বহির্বিশ্বে সকল ক্ষেত্রে আজ বাঙ্গালী নারী তার যোগ্যতা, দক্ষতা, পারদর্শিতা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। মাৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে নারী সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা বাংলাদেশে খুব বেশী দিনের না হলেও ইতোমধ্যে তারা জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত স্থান করে নিয়েছে। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী, আর নীতিগতভাবে এই বিশাল নারী জনগোষ্ঠীকে আরও সম্পদশালী করতে চিহ্নিত বাধাগুলি অপসারণ করে জাতীয় নীতিমালা দ্বারা যথাযথভাবে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে তবেই দেশের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক খাত মাৎস্য খাতের উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। সে প্রত্যাশাই হোক আমাদের সকলের।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণে সংক্রমণের উৎস শনাক্তকরণের গুরুত্ব
(Importance of Traceability on the Quality Control of Fish and Fisheries Products)

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
মোঃ রফিকুল ইসলাম
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract

Safe and dependable aquafood is a recent challenge for sustaining in global seafood markets. Previously quality problems mainly dealt with decomposition, filth content and pathogenic bacteria-contamination from poorly addressed post harvest chain due to lack of infrastructure facilities. Now a days, environment, human right, child labour, gender development etc are considered as a part of quality assurance, as a result of total global fisheries are critical juncture. In the recent years introduction of Bio-terrorism Act, antidumping Act and directives of traceability made this business more complicated. Globalization of the fish industry in terms of sourcing of raw materials, processing and marketing has resulted in demands for increased traceability of products. This is due to mainly to the increased length of the supply chain providing more opportunity for fishery products to either less quality or accelerate the detrimental effect to cause harm to the consumer. In order to ensure both the quality and safety of products, effective HACCP implementation considering traceability is the only solution to overcome the present crisis

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য একটি অতি দ্রুত পচনশীল পণ্য। এর সুষ্ঠু মাননিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ বিষয়টি খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর। মাছচাষ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি ধাপে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ভোক্তাদের চাহিদা অনুসারে, মানসম্পন্ন মৎস্য পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব। নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য মৎস্য পণ্যের ব্যবসা এখন সারা বিশ্বের চাহিদা। ইতোপূর্বে মৎস্য পণ্যের যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়েছিল তা ছিল মাছের পচন, ফিলথ যুক্ত এবং সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু। এর প্রধান কারণ ছিল অস্বাস্থ্যকর পন্থায় মৎস্য ধরা ও বাজারজাত করা। আশির দশকে মৎস্য পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা এবং ধরার পর পর্যাপ্ত বরফের ব্যবহার নিশ্চিত করে পণ্যের মানের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের দৈনন্দিন চাহিদা, মানুষের জীবন ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য তৈরি এবং ভক্ষণের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এজন্যই উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাব্য দূষণ রোধ করে বা নিয়ন্ত্রণ করে বা দূষণকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নামিয়ে এনে ভোক্তাদের চাহিদামত পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্যাসাপ প্রথা চালু হয়েছে। ১৯৯৫ সালের পর পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই US FDA কর্তৃক প্রণীত হ্যাসাপ বিভিন্ন নামে বাস্তবায়ন করা শুরু করে। কিন্তু বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই প্রথা বাস্তবায়ন করা খুব সহজসাধ্য নয়। তথাপি ১৯৯৭ সালে HACCP প্রথা বাস্তবায়ন শুরুর ফলে এই সেক্টরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

হ্যাসাপ (HACCP-Hazzard Analysis Critical Control Point) এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রয়োগের ফলে কোন পণ্য উৎপাদনের শুরু থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সব ধরনের দূষণ থেকে রক্ষা করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ হ্যাসাপ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রেতার চাহিদা অনুসারে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও বিপননে সহায়তা করে। হ্যাসাপ পদ্ধতির মাধ্যমে পণ্যের দূষণের যে কোন পর্যায় চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের উপায় নিরূপণ করা সম্ভব। একারণে হ্যাসাপ প্রথা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বে বিবেচিত হয়ে আসছে। HACCP System বাস্তবায়ন করতে হলে Risk Analysis এর মাধ্যমে Risk Assess করে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর এ কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে হলে প্রতিটি Risk বা Contamination উৎস খুঁজে বের করতে হবে। যার জন্য EU Traceability Regulation

178/2002 জারী করেছে। USFDA Public Health Security And Biotermin Act-2002 খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে একই ধরনের তথ্য সংরক্ষণের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। ইতোমধ্যে হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের ক্ষেত্রে হ্যাসাপ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু Traceability নিয়ে এখন গবেষণা চলছে। কোন কোন দেশ ইতোমধ্যে ইহা বাধ্যতামূলক করেছে। বাংলাদেশও মৎস্য পন্যের Traceability শনাক্ত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

Traceability বলতে আমরা কি বুঝি

সাদামাঠাভাবে আমরা বলতে পারি কোন দূষণ কোথায়, কখন কি অবস্থায় সংগঠিত হয়েছে তা নির্ধারণ করাকেই Traceability বলা হয়। FAO, Codex Alimentation Commission, International Standard Organization (ISO), Traceability কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। Codex Alimentarius Commission এর মতে Traceability বলতে কোন ১টি কর্ম প্রক্রিয়া কিভাবে, কখন, কোথায়, কার মাধ্যমে সংঘঠিত হয়েছে তার ইতিহাস, ব্যবহার বা অবস্থার শনাক্ত করণের ক্ষমতাকে Traceability বলে।

ISO-9001-2000 এর মতে বিবেচনাধীন কোন বিষয়ের ট্রেসিবিলিটি হলো ঐ বিষয়টির ইতিহাস, ব্যবহার বা অবস্থান শনাক্তকরণের ক্ষমতা।

Traceability সাধারণত ২ প্রকার ঃ

ক. অভ্যন্তরীণ বা ইন্টারনাল Traceability.

খ. চেইন ট্রেসিবিলিটি বা External Traceability

ক. অভ্যন্তরীণ বা ইন্টারন্যাশনাল Traceability

ফুড চেইনের বা সরবরাহ চেইনের বা প্রক্রিয়াজাতকরণের কোন একটি ধাপে বা ১টি ব্যাচের কর্ম প্রবাহ শনাক্ত করার ক্ষমতাকে অভ্যন্তরীণ Traceability বলে।

খ. চেইন Traceability

কোন একটি খাদ্যদ্রব্য তৈরির সরবরাহ চেইনের শুরু থেকে প্রক্রিয়াকরণের শেষ ধাপ পর্যন্ত পণ্যের পরিচিতি সম্পর্কিত সংগৃহীত ও সংরক্ষিত তথ্যসমূহকে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের ইতিহাস, ব্যবহার বা অবস্থান বা দূষন শনাক্তকরণ ক্ষমতাকে চেইন ট্রেসিবিলিটি বলে।

বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের Traceability নির্ধারণ করতে হলে কাঁচামাল সরবরাহ চেইনের প্রতিটি পর্যায়ের মৎস্য চিংড়ি বা মাছের পোনা উৎপাদন, চাষ, ধরা, সরবরাহ, ডিপো/আড়তে সরবরাহ বরফ ব্যবহার এবং সর্বোপরি প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রতিটি ধরণের ইতিহাস জানতে হবে ও তার যথাযথ রেকর্ড সংগ্রহ করতে হবে। বাংলাদেশের মাছ/চিংড়ি চাষ সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সারা দেশের পানির, মাটির, ব্যবহৃত খাদ্য বরফ, পরিবেশ সকল কিছুর ইতিহাস জানতে হবে এবং সকল বিষয়ে গবেষণা লব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে Traceability নিশ্চিত করতে হবে।

মৎস্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সংক্রমণের উৎস

ক্রেতাদেশ এবং ক্রেতারা ঝুঁকিবিহীন নিরাপদ খাদ্য তৈরির জন্য এখন নতুন নতুন বিষয় বিবেচনায় আনছে। বিশেষ করে পরিবেশ, শিশু শ্রম, মানবাধিকার, নারী অধিকার ইত্যাদি বিষয় জুড়ে দিয়েছে। যার ফলে মৎস্য পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখন একটি আন্তর্জাতিক আর্বতে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ইতোমধ্যে WTO, agreement অনুসারে SPS measures, US FDA Bioterrorism Act, Antidumping Act চালু করেছে। পাশাপাশি E U জানুয়ারী ২০০৫ হতে উৎপাদিত পণ্যের সংক্রমণের উৎস নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দিয়েছে। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে কোন রাসায়নিক দ্রব্য বা অন্য কোন ক্ষতিকর জীবাণু আছে কিনা তা নিশ্চিত করা এখন যুগের চাহিদা।

সংক্রমণের উৎস নির্ধারণ

বিশ্বখাদ্য সংস্থার মতে ইহা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদনের প্রতিটি ইতিহাস জানা যাবে। অর্থাৎ পণ্য কোন এন্টিবায়োটিক, কীটনাশক এবং হরমোন বা রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হলে কোন অবস্থায়, কোথায়, কখন কিভাবে সংক্রমিত হচ্ছে বা হয়েছে তার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দূষণের কারণ এবং তার প্রকৃত উৎস নিরূপণ করে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

নিচের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছক (Decision Tree) অনুসরণ করে পণ্য উৎপাদন করা হলে পণ্যের সংক্রমণের উৎস নিশ্চিত করা সম্ভব।

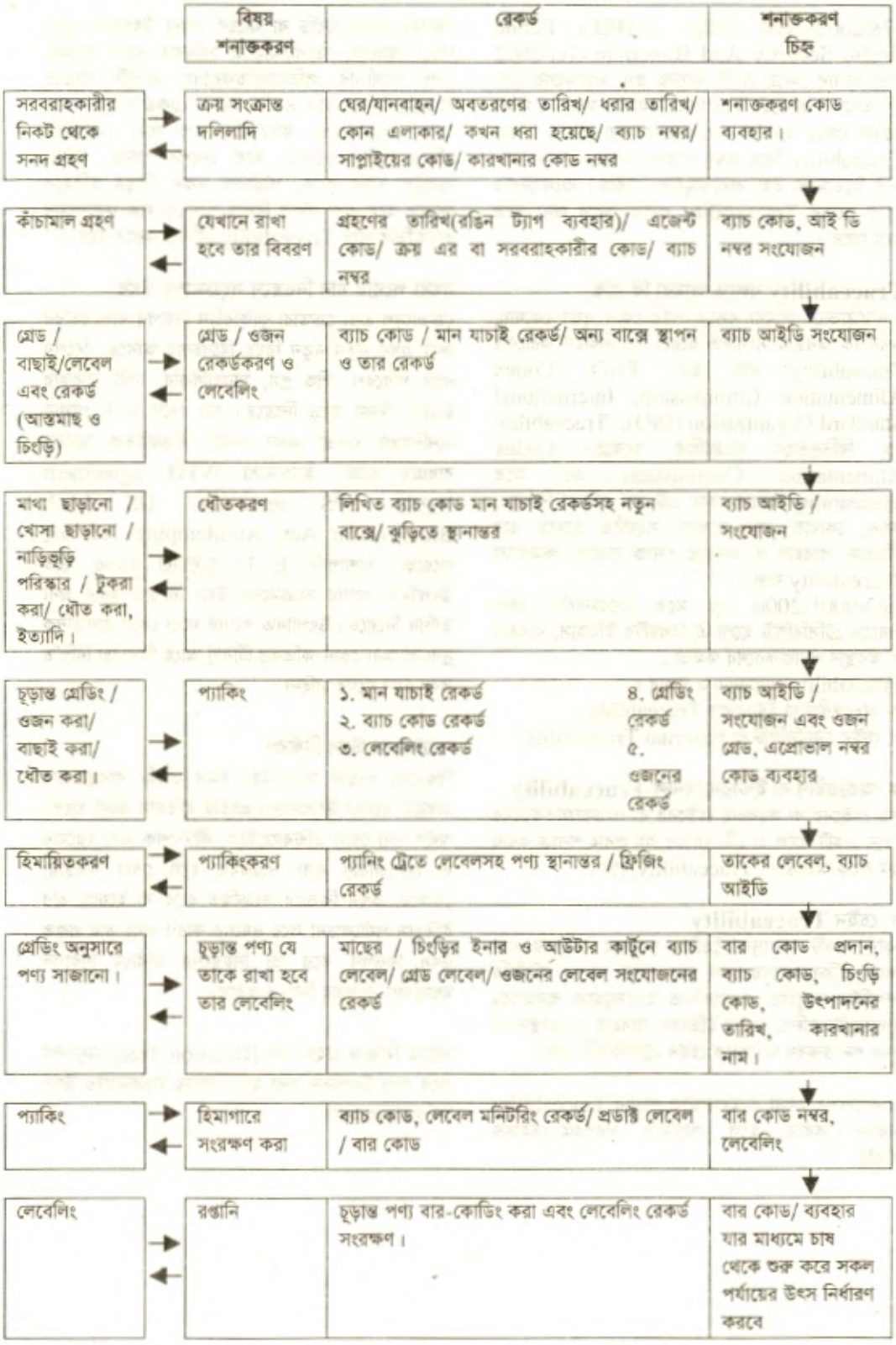
বিষয় শনাক্তকরণ
রেকর্ড
শনাক্তকরণ চিহ্ন
সরবরাহকারীর নিকট থেকে সনদ গ্রহণ
ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি
ঘের/যানবাহন/ অবতরণের তারিখ/ ধরার তারিখ/ কোন এলাকার/ কখন ধরা হয়েছে/ ব্যাচ নম্বর/ সাপ্লাইয়ের কোড/ কারখানার কোড নম্বর
শনাক্তকরণ কোড ব্যবহার।
কাঁচামাল গ্রহণ
যেখানে রাখা হবে তার বিবরণ
গ্রহণের তারিখ(রঙিন ট্যাগ ব্যবহার)/ এজেন্ট কোড/ ক্রয় এর বা সরবরাহকারীর কোড/ ব্যাচ নম্বর
ব্যাচ কোড, আই ডি নম্বর সংযোজন
গ্রেড / বাছাই/লেবেল এবং রেকর্ড (আস্তমাছ ও চিংড়ি)
গ্রেড / ওজন রেকর্ডকরণ ও লেবেলিং
ব্যাচ কোড / মান যাচাই রেকর্ড/ অন্য বাক্সে স্থাপন ও তার রেকর্ড
ব্যাচ আইডি সংযোজন
মাথা ছাড়ানো / খোসা ছাড়ানো / নাড়িভূড়ি পরিস্কার / টুকরা করা/ ধৌত করা, ইত্যাদি।
ধৌতকরণ
লিখিত ব্যাচ কোড মান যাচাই রেকর্ডসহ নতুন বাক্সে/ ঝুড়িতে স্থানান্তর
ব্যাচ আইডি / সংযোজন
চূড়ান্ত গ্রেডিং / ওজন করা/ বাছাই করা/ ধৌত করা।
প্যাকিং
১. মান যাচাই রেকর্ড
২. ব্যাচ কোড রেকর্ড
৩. লেবেলিং রেকর্ড
৪. গ্রেডিং রেকর্ড
৫. ওজনের রেকর্ড
ব্যাচ আইডি / সংযোজন এবং ওজন গ্রেড, এপ্রোভাল নম্বর কোড ব্যবহার
হিমায়িতকরণ
প্যাকিংকরণ
প্যানিং ট্রেতে লেবেলসহ পণ্য স্থানান্তর / ফ্রিজিং রেকর্ড
তাকের লেবেল, ব্যাচ আইডি
গ্রেডিং অনুসারে পণ্য সাজানো।
চূড়ান্ত পণ্য যে তাকে রাখা হবে তার লেবেলিং
মাছের / চিংড়ির ইনার ও আউটার কার্টুনে ব্যাচ লেবেল/ গ্রেড লেবেল/ ওজনের লেবেল সংযোজনের রেকর্ড
বার কোড প্রদান, ব্যাচ কোড, চিংড়ি কোড, উৎপাদনের তারিখ, কারখানার নাম।
প্যাকিং
হিমাগারে সংরক্ষণ করা
ব্যাচ কোড, লেবেল মনিটরিং রেকর্ড/ প্রডাক্ট লেবেল / বার কোড
বার কোড নম্বর, লেবেলিং
লেবেলিং
রপ্তানি
চূড়ান্ত পণ্য বার-কোডিং করা এবং লেবেলিং রেকর্ড সংরক্ষণ।
বার কোড/ ব্যবহার যার মাধ্যমে চাষ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের উৎস নির্ধারণ করবে

সংক্রমণের উৎস শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা কি?

আন্তর্জাতিক বিশ্বে যেকোন খাদ্য দ্রব্যের মানসম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কাচামালের উৎস হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের উপাদানের উৎস নির্ধারণ করা এখনও অপরিহার্য। উৎপাদিত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ এবং তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ভোক্তাদের চাহিদা যেকোন ধরনের খাদ্য ঝুঁকি এড়িয়ে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্রেতার ও ভোক্তার বিশ্বস্থতা অর্জনই Traceability এর মূল উদ্দেশ্যে।

পণ্যের Traceability নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবেঃ

ক. নিরাপদ উপাদান দ্বারা পণ্য তৈরিকরণ এবং পণ্যের ইতিহাস সম্পর্কে সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করা;

খ. উপাদানের মধ্যে কোন Antibiotic, Hormon, Pesticide বা অন্যকোন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হয়েছে কিনা তা শনাক্তকরণ এবং তার মাত্রা নির্ধারণ;

গ. উৎপাদিত পণ্যের ঝুঁকি নির্ধারণ;

ঘ. প্রতারণা রোধ করা এবং লেবেলিং ক্লেইম রোধ করা।

কারখানায় কিভাবে Traceability বাস্তবায়ন করবে?

একটি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের Traceability নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবেঃ

১. কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল দ্বারা ব্যবস্থপনা দল গঠন করা

২. ফ্লো-ডায়াগ্রাম নির্ধারণ করা

৩. কি প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদিত হবে তা যাচাই করা

৪. রেকর্ড যথাযথভাবে আছে কিনা তা যাচাই করা

৫. কারখানার স্থাপনাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া

৬. কারখানার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পরিচালিত করা

৭. কাঁচামাল উৎপাদন থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি কাজের রেকর্ড স্বচ্ছতার সাথে সংরক্ষণ করা

৮। উৎপাদিত পণ্যের প্রতিটি পর্যায়ের কোড নম্বর/আইডি নম্বর প্রকাশ করা এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

সংক্রমণের উৎস নির্ণয়ে বিশ্ব ও বাংলাদেশে অবস্থান

১৯৯৭ সালের পর থেকে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ সেক্টরের যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। Codex Guideline অনুসারে সারা বিশ্বই এব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশই এখন পর্যন্ত কাঁচামালের উৎপাদনের উৎস থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের শেষ ধাপ পর্যন্ত সংক্রমণের উৎস ১০০% নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় নাই। তবে যে সব দেশে মাছ/চিংড়ি সমন্বিত চাষ ব্যবস্থা চালু আছে এবং যাদের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় চিংড়িচাষ হচ্ছে সে সব দেশ পণ্যের সংক্রমণের উৎস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে আছে। তাছাড়া মাছ ও চিংড়ি চাষে এবং উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে যে সব নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য, ক্ষতিকর জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে তার ক্ষতির মাত্রা নিয়ে এখনও সংশয় রয়ে গেছে। এজন্য প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন। বর্তমান হ্যাসাপ সিষ্টেম, তাই পণ্যের দূষণের মাত্রা যা খাদ্যকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলে তা শনাক্ত করার জন্য জোর তাগিদ দিচ্ছে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশও কাজ করছে। বিগত বছরগুলোতে এ্যাকুয়াকালচার রেসিডিও মনিটরিং- এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর থেকে প্রায় ৪৫৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ সব নমুনার মধ্যে মাত্রাতিরক্ত কোন রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া যায় নাই। তবে বেশ কিছু ঘেরের পানিতে মৎস্য খাদ্য এবং হ্যাচারীর পানিতে Antibiotic শনাক্ত হয়েছে।

পণ্যের সংক্রমণের উৎস নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের জন্য করণীয়

বাংলাদেশের মাছ/চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সারাদেশে বিস্তৃত। বর্তমানে চিংড়ি/মাছের ক্ষেত্রে সাপ্লাইয়ার্স সার্টিফিকেট প্রথা চালু আছে। কিন্তু এই প্রথা পণ্যের প্রকৃত উৎস নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে। বাংলাদেশের মৎস্য ব্যবসার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যসত্বভোগী জড়িত রয়েছেন। পোনা উৎপাদন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীকে সমন্বিত করতে না পারলে এই সেক্টরের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। এজন্য যে কাজগুলো পর্যায়ক্রমে করা প্রয়োজন তাহলো -

- বাংলাদেশের চিংড়ি ও অধিক মৎস্য উৎপাদন এলাকাগুলোকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা,
- অঞ্চলভিত্তিক মৎস্য ঘের/পুকুর/খালবিল- এর মাটি ও পানির মানসম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা
- প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একটি কোড বা লেবেলের ব্যবস্থা চালু করা যা উক্ত পণ্যের প্রকৃত উৎস কি তা নির্ধারণ করবে
- চিংড়ি, মাছের হ্যাচারিগুলোকে লাইসেন্সের আওতায় আনা এবং এদেরকে বিভিন্ন কোডে ভাগ করা

- এলাকা ভাগ করে প্রতিটি লাইসেন্স প্রাপ্ত হ্যাচারির জন্য লেবেলিং এবং কোডিং প্রথার ব্যবস্থা করা
- পোনা সরবরাহকালে সরবরাহকারী কোন খামার, হ্যাচারি হতে পোনা সংগ্রহ করছে তার কোড ব্যবহার করা
- পোনা উৎপাদন কালে হ্যাচারির মালিকগণ যেসব উপাদান ব্যবহার করবে তার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনসহ তালিকা রাখা এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা
- চিংড়ি ও মাছ ব্যবসার সাথে জড়িত বিশেষ করে যারা মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় চিংড়ি/মাছ সরবরাহ করে তাদের লাইসেন্স প্রদান করা
- লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিপো/আড়তের মাধ্যমে মাছ/চিংড়ি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা
- উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, মধ্যস্বত্বভোগী সকলের জন্য কোড নম্বর ও লেবেলিং ব্যবস্থা চালু করা
- কারখানা পণ্য গ্রহণকালে সরবরাহকারীর সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা
- পণ্য গ্রহণ কালে উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তার লেবেল, কোড ও ব্যাচ নম্বর ব্যবহার নিশ্চিত করা
- কারখানার প্রতিধাপের সকল রেকর্ড/দলিলাদি স্বচ্ছতার সাথে সংরক্ষণ করা। সংগৃহিত রেকর্ড মনিটর কালে যাতে প্রকৃত উৎস নির্ধারিত হয় তা নিশ্চিত করা
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা
- অঞ্চল হিসেবে ভাগ করা চিংড়ি/মৎস্য উৎপাদনের জোনগুলোতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের তদারকি জোরদার করা
- প্রতিটি জোনের পণ্যের সংক্রমণের উৎস নিশ্চিত করার জন্য ধরার পর কারখানায় সরবরাহের পূর্বে প্রতিটি জোনের Symbolic Code সহ পণ্যের সনদায়নের ব্যবস্থা করা
- রোগ, জীবানু, ভাইরাসমুক্ত এবং কোন রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সংক্রমিত নহে এমন মাছ হতে রেণু, পোনা উৎপাদন করা
- কোড নম্বরের একটি ষ্ট্যান্ডার্ড ফরমেট তৈরী করা। এক্ষেত্রে EAN-UCC কোডিং সিস্টেম অনুসরণ করা যেতে পারে।

Traceability পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

একটি কার্যকর Traceability পদ্ধতির মাধ্যমে যে সকল সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তা হলো নিম্নরূপ ঃ

- দূষিত পণ্য দ্রুত ও সহজে প্রত্যাহার এবং তা রিকল (Recall) করে ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ঝুকি, আর্থিক ঝুকি ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষা করা যায়
- দূষিত পণ্য সহজে শনাক্ত করা এবং কোন কারখানায় সমুদয় পণ্য ধ্বংস না করে রিকল প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট দিনের বা লটের পণ্য শনাক্ত করা যায়। ফলে ভোক্তা ও সরবরাহকারী দুজনেই আর্থিক ঝুকি ও সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারে
- পণ্য শনাক্ত করণের মাধ্যমে পৃথকীকরণ করা যায়
- কোন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় নিরাপদ নয় এমন ঝুকিপূর্ণ খাদ্য শনাক্তের মাধ্যমে রিকল করতে সক্ষম হলে ঐ খাদ্য সম্পর্কে এবং প্রক্রিয়াজাতকারী সম্পর্কে ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধি করে
- বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা এবং পণ্যের গুনগতমান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে ফলে ঐ কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
- একটি ফুড চেইনের সাথে জড়িত সকলের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের ১টি চক্র তৈরি হয়। ফলে পণ্যের গুনগতমান এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় উন্নয়নসহ নতুন ধরনের পণ্য উদ্ভাবনে আগ্রহ সৃষ্টি করে
- উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহের প্রবাহ পথকে সহজ ও স্বচ্ছতা প্রদান করে ও চেইনের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ফলে ব্যবসায়ীক অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়
- ব্যবসা হতে ব্যবসায়, ভোক্তাদের, সরকারী কর্তৃপক্ষকে এবং আর্থিক ও কারিগরী নিরীক্ষায় নিয়োজিতদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানে সহায়তা করে
- সৃষ্ট কোন নির্দিষ্ট সমস্যা বা ত্রুটি নিরূপনে দায় দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে এবং
- কোম্পানীর বা ব্রান্ডের সুনাম রক্ষায় সাহায্য করে।

আর্ন্তজাতিক বাজারে ভোক্তাদের এবং আমদানিকারক দেশের চাহিদা অনুসারে নিরাপদ, মানসম্পন্ন মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে পণ্য বাজারজাত করতে হলে এখন থেকে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মৎস্যচাষী, পোনা উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, মধ্যস্বত্বভোগী প্রক্রিয়াজাতকারক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন। নচেৎ আগামী বৎসরগুলোতে বর্তমান বিশ্বের যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে তা থেকে উত্তরণ দুরূহ হবে। এব্যাপারে যেসকল SPS measure গুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন প্রক্রিয়াজাতকারকগণ তাদের ব্যবসার স্বার্থেই তা অনুসরণ করবে। সকলের সম্মিলিত ভাবে একযোগে কাজ করলেই এই সেক্টরের উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের উৎস শনাক্ত করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। এর ফলে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই খাত হতে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

জাটকাকে ইলিশ হতে দিন

(Let Jatka to grow Hilsa)

সুবোধ চন্দ্র ঢালী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

Abstract

Hilsa, the national fish of Bangladesh has been playing a very important role in our economy. Now country's annual Hilsa production is 2 lakh 55 thousands m.t. If brood Hilsa are allowed to breed and undersized (below 9 inch) are not caught, Hilsa production may be double with an estimated value of Tk. nine thousand core. For the purpose, alongwith the allowing of undisturbed spawning of brood Hilsa, undersized Hilsa should not be caught from month of November to May each year. The poor Hilsa fishers during ban period of Jatka should be rehabilitated through alternative income generating activities, Vulnerable Group Feeding programme etc. Since 2003-2004 Govt. of Bangladesh has initiated "Jatka Rakkha Karmasuchi" to protect Jatka (undersized Hilsa). This programme is on going in 75 upazillas of 20 districts rich in Jatka. Activities like awareness campaign, mass gathering of Hilsa fishers and traders, rallies, maiking, distribution of leaflets and posters, conducting mobile courts etc. are in implementation. Initially in some areas, Govt. has undertaken rehabilitation programme for pro-poor Jatka fishers through food assistance under VGF and VGD programme. After one year of implementation of "Jatka Rakkha Karmasuchi" a possitive impact on Hilsa fishery has already been observed. "Special operation code" and " Rehabilitation and Development of Jatka fishers"-two new financial code has already been created for the conservation of Hilsa. In near future, expansion of such programme for Jatka fishers may result very positive impact on Hilsa fishery.

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। জাতীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য আর গর্বের সাথে মিশে আছে ইলিশের স্বাদ, গন্ধ আর রূপ। এ মাছের রয়েছে ব্যাপক অর্থনৈতিক গুরুত্ব। সম্পূর্ণ প্রকৃতি প্রদত্ত এ সম্পদ থেকে বছরে আয় হয় পাঁচ হাজার কোটি টাকা এবং জিডিপিতে এর অবদান শতকরা দেড় ভাগ। অভিপ্রয়ানশীল (Migratory) এ মাছের ডিম ছাড়ার সুযোগ সৃষ্টি ও জাটকা নিধন বন্ধ করতে পারলে ইলিশের বর্তমান উৎপাদন ২ লক্ষ ৫৫ হাজার মেট্রিক টনকে সহজেই দ্বিগুনে উন্নীত করা সম্ভব। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা। (উল্লেখ্য, দেশের সবচেয়ে বড়, আকর্ষনীয় ও গর্বের সেতুর নাম 'যমুনা সেতু'- যা নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে তিন হাজার ৮০০ কোটি টাকা। সহজেই অনুমেয়, কোন রকম বিদেশী সহায়তা ছাড়াই শুধুমাত্র উৎপাদিত ইলিশের দাম দিয়ে প্রতিবছর 'যমুনা সেতু'র মত বড় বড় কয়েকটি সেতু নির্মাণ করা যেতে পারে)।

অত্যন্ত সুস্বাদু ও লোভনীয় এ মাছ আমাদের দেশের নদ-নদীতে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতির এ দান, দেশের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদস্বরূপ। এ মাছ বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় প্রতিবেশী বা পার্শ্ববর্তী দেশেও ততটা পাওয়া যায় না। অন্যান্য মাছের মত এ মাছকে চাষ করতে হয় না, লালন-পালন করতে হয় না, খেতেও দিতে হয় না। এক্ষেত্রে কারো কোন বিনিয়োগও নেই। শুধু প্রয়োজন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেলে ভাইদের ইলিশের বর্ধনশীল বাচ্চাগুলো (জাটকা) ধরা থেকে বিরত রাখা। তাও মাত্র ক'টি মাসের জন্য, তাদের নিজেদের স্বার্থে। কারণ ছোট ছোট জাটকা (৯ ইঞ্চির ছোট ইলিশকে জাটকা বলে) যখন দেড় -দু' কেজি ওজনের ইলিশ হয়ে নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করবে- তখন জেলেরাই এ মাছ ধরতে যাবে, অন্য কেউ নয়। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে- ততদিন জেলেরা খাবে কি? ইলিশ সম্পদ বৃদ্ধির কৌশল প্রণয়নের মূল লক্ষ্য, এটিই। দেশ-জাতি, সরকার ও সর্বস্তরের জনগণকে খুঁজতে হবে এ কৌশল।

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এদের ডিমছাড়াকে নির্বিঘ্ন করতে হবে এবং নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত জাটকা ধরা থেকে জেলেদের বিরত রাখতে হবে। ইলিশ জেলেরা

বংশ পরম্পরায় মাছ ধরেই জীবন-জীবিকা তথা সংসার চালিয়ে আসছে। জলের সাথে মিলেমিশে মাছ ধরাই তাদের নেশা, পেশা ও অনেকের একমাত্র যোগ্যতা। ইলিশ ও জাটকা আহরণকারী জেলেরা অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এসব জেলেদের বাৎসরিক গড় আয় মাত্র ১৪,৪০০ টাকা, যা অন্যান্য দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর আয়ের মাত্র ৩৭% এবং জাতীয় গড় আয়ের ২৫%। শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহ তথা বেঁচে থাকার জন্য তারা জাটকা ধরার মত অপরাধমূলক কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য হচেছ। হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, ছাগল পালন, মাছ চাষ, মাছের পোনা উৎপাদন, কুটিরশিল্প, সেলাই ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পানি সম্পদ, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থপনা ইত্যাদি মন্ত্রণালয়সমূহের ক্ষুদ্রঋণ, অনুদান, জিআর, টিআর, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে এসব দরিদ্র জেলেদেরকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সংযুক্ত করতে হবে। মাছ ধরা থেকে বিরত রাখার সময়ে তাদেরকে দিতে হবে খাদ্য সহায়তা, করতে হবে বিকল্প কর্মসংস্থান, দিতে হবে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণসহ পূণর্বাসনের সুযোগ। তাদের মধ্যে ইজারা বন্দোবস্ত দিতে হবে খাস জলমহাল ও খাস জমি। বিল, বাঁওড় ও মুক্ত জলাশয়ে তাদেরকে অধিকার দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে মাছ চাষে।

মৎস্য অধিদপ্তরের ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, দেশের জাটকা সমৃদ্ধ ২০টি জেলায় জেলে ও মৎস্যজীবীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৫ হাজারের মত। তাদেরকে প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত মাথাপিছু ৩০ কেজি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হলে মোট খাদ্যের প্রয়োজন হয় মাত্র ৬০ হাজার মে. টন। তাছাড়া জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ এ বিষয়ে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার জাটকা রক্ষায় জনমত গঠনে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য বাস্তবধর্মী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর পাশাপাশি দরকার জনমত গঠনে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালানো।

২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ সরকার জাটকা রক্ষা কর্মসুচির ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ অর্থবছরেই সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচির জন্য জাতীয় বাজেটে পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃষ্টি করে এবং দু'দফায় ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের এ বরাদ্দ থেকেই দেশের জাটকা সমৃদ্ধ ২০টি জেলার (চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ ও গাইবান্ধা) ৭৫টি উপজেলায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা, সমাবেশ, সড়ক র‍্যালি, নৌর‍্যালি, হাট-বাজারে মাইকিং, প্রচারপত্র ও পোষ্টার বিতরণ, নৌবাহিনী, কোষ্ট গার্ড, স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ সমন্বয়ে জলে-স্থলে ভ্রাম্যমান আদালত ও ঝটিকা অভিযান পরিচালনা এবং চাঁদপুর জেলার ২২ হাজার জেলেকে ভিজিএফ এর আওতায় জনপ্রতি ১০ কেজি করে চাল ও ভিজিডি এর আওতায় আরো ১০ কেজি করে চাল প্রদান করা হয়েছে।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালনে বর্তমান সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বছর এখাতে দু'ধাপে প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের ৬টি জেলার (চাঁদপুর, লক্ষীপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুণা) হত-দরিদ্র জেলেদেরকে এক হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য 'জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন' শীর্ষক কর্মসূচি নামক পৃথক অর্থনৈতিক কোড সৃষ্টি করে দু'কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যা দিয়ে এ বছর ৭টি জেলা (চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুণা, পিরোজপুর ও শরীয়তপুর) জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চলমান এ কর্মসূচিকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৫-৬ অর্থবছরের জন্য তিন কোটি ও ২০০৬-৭ অর্থবছরের জন্য পাঁচ কোটি টাকার বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রচার-প্রচারণা, নৌ-বাহিনী, কোষ্টগার্ড, জেলা প্রশাসনসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে জাটকা রক্ষায় আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। মৎস্যজীবীরাও জাটকা ধরার কুফল ইতোমধ্যেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, সরকার কর্তৃক মাত্র ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার কর্মসূচি আর জনসচেতনতার কারণে দেশের ইলিশ উৎপাদন ২০০২-৩ অর্থবছরের এক লক্ষ ৯৯ হাজার মে.টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩-৪ অর্থবছরে দু'লক্ষ ৫৫ হাজার মে.টনে উন্নীত হয়েছে। বাড়তি ৫৬ হাজার মে.টন ইলিশের আনুমানিক মূল্য হবে প্রায় ৮৪০ কোটি টাকা । শুধু তাই নয়, এই ৮৪০ কোটি টাকার ইলিশের বাড়তি উৎপাদনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন পর আবার আমরা পেয়েছিলাম হারিয়ে যাওয়া বড় আকারের ইলিশ। দেশের ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে কারেন্ট জালের অবাধ ব্যবহার। কারেন্ট জাল উৎপাদন, বিপণন, ব্যবহার, পরিবহণ, ও সংরক্ষণ আইনতঃ নিষিদ্ধ হলেও হাইকোর্টের

এক আদেশে সাময়িকভাবে তা স্থগিত থাকায় কারেন্ট জাল ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ধ্বংসলীলা অব্যাহত আছে। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মৎস্য সম্পদ। নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড ও ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অভিযান চালিয়ে নদ-নদী থেকে কারেন্ট জাল উদ্ধার করে আগুন উৎসব করার চেয়ে উৎপাদন বন্ধ করা অনেক সহজ ও কার্যকর। মৎস্য সম্পদ ও জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে বিষয়টির জরুরীভাবে সুরাহা প্রয়োজন।

গণসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রচারের বিকল্প নেই। প্রচার-প্রচারণার শক্তি অপরিসীম। প্রচারের বদৌলতে বৃক্ষ রোপন, পাকা লেট্রিনের ব্যবহার ও আর্সেনিকমুক্ত পানি পান, শিশুর ৬টি ভয়ংকর রোগের টিকা খাওয়া ইত্যাদি এক একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। জাটকা নিধন প্রতিরোধেও সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করতে পারলে জাটকা ধরা, বেচা, কেনা বা খাওয়া বন্ধ হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে সরকারের মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম. এহসানুল হক মিলনের 'জাটকা রক্ষা কর্মসূচি-চাঁদপুর মডেল' কে অনুসরণ করা যেতে পারে। তিনি চাঁদপুরে সবগুলো সরকারি-বেসরকারি অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-শিক্ষক, আইনজীবী-সাংবাদিক, জেলে-মজুরসহ সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সভা-সমাবেশ, সড়ক র‍্যালি, নৌ-র‍্যালি, মেঘনা বক্ষে অভিযান পরিচালনা করে ব্যাপক জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে মৎস্য অধিদপ্তরের জাটকা রক্ষা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত ও সর্বস্তরের মানুষের নিজস্ব কর্মসূচিতে পরিনত হয়েছে। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল ধরে এ জাতীয় কর্মসূচীর সম্প্রসারণ দরকার।

সরকার ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় দেশে ইলিশের জন্য ৪টি অভয়াশ্রম (Sanctuary) ঘোষনা করেছে। অভয়াশ্রমগুলো হলো: (১) মেঘনা নদীর ষাটনল হতে চরআলেকজান্ডার পর্যন্ত প্রায় ১০০ কিলোমিটার (২) ভোলার ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালীর চররুস্তম পর্যন্ত (তেতুলিয়া নদী)-প্রায় ১০০ কিলোমিটার (৩) ভোলার মদনপুর/চর ইলিশা থেকে চরপিয়াল পর্যন্ত (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর চ্যানেল)-প্রায় ৯০ কিলোমিটার ও (৪) পটুয়াখালীর জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদী-প্রায় ৪০ কিলোমিটার। এ অভয়াশ্রম ৪টির প্রথম ৩টিতে প্রতি বছরের মার্চ থেকে এপ্রিল এবং চতুর্থটিতে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে।

ইলিশ মাছের উৎপাদন বাড়াতে ডিমওয়ালা মাছ নিধন না করে এদের ডিম ছাড়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়ে। এর মধ্যে ৭০-৮০ ভাগই ডিমওয়ালা ইলিশ। ইতোমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের ৪টি প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে ১৫ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর (১ থেকে ১০ আশ্বিন পর্যন্ত বড় পূর্ণিমার ১০ দিন) ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ হলো- মিরেরসরাই এর শাহেরখালী/হাইতকান্দি পয়েন্ট, দক্ষিণ তজুমুদ্দিন/পশ্চিম সৈয়দ আওলিয়া পয়েন্ট, উত্তর কুতুবদিয়া/গন্ডামারা পয়েন্ট ও কলাপাড়ার লতা চাপালি পয়েন্ট।

উল্লিখিত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অকৃত্রিম দেশাত্ববোধ ও খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ। তাছাড়া অগ্রসর চিন্তার ধারক মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতের অগ্রগতির পুরোধা মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল নোমানের যোগ্য নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, সকল পর্যায়ের জন প্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পেশাজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়ায় এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

জাটকা রক্ষা কর্মসূচির সফলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতদিন জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জাটকা রক্ষা অভিযান পরিচালিত হলেও পুরো কার্যক্রমটির কোন দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না। ২০০৩-০৪ সালে চাঁদপুর বা লক্ষ্মীপুরের জেলেরা মেঘনা বক্ষে মৌসুম জুড়ে কোন জাটকা ধরতে না নামলেও শরীয়তপুর, মাদারীপুর বা নিম্নাঞ্চলের জেলেরা অবাধে জাটকা নিধন করেছে। এবারে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। চাঁদপুর জেলার পাশাপাশি আরো ৫টি জেলার জেলেদের খাদ্য সহায়তা সম্প্রসারণ এবং এবারই প্রথম ৭টি জেলায় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে । বাজেট বরাদ্দের জন্য এখাতে সৃষ্টি হয়েছে 'বিশেষ অপারেশন কোড' এবং 'জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন শীর্ষক উন্নয়ন কর্মসূচি' নামক পৃথক অর্থনৈতিক কোড। তবে আগামীতে খাদ্য সহায়তা ও বিকল্প কর্মসংস্থান সহায়তা জাটকা সমৃদ্ধ ২০টি জেলার ৭৫টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হলে এ দেশের ইলিশ সম্পদ আরো সমৃদ্ধশালী হবে বলে আশা করা যায়।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ইলিশের ডিম ছাড়াকে নির্বিঘ্ন করে এবং জাটকাকে বড় ইলিশ হবার সুযোগ দিয়ে দেশের কৃষ্টি, ঐতিহ্য তথা অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

নদী এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চল ছাড়াও মধুমতি, চিত্রা, নবগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, ধনু, কালি নদী, কুশিয়ারা, সুরমা, বেতুয়া, কুমিরাখাল, কর্ণফুলী, মহানন্দা, হুরাসাগর এবং গড়াই নদীকে ইলিশ মাছের প্রধান অঞ্চলরূপে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত তথ্য থেকে ধারণা করা যায় যে এক সময় বাংলাদেশ ভূ-ভাগের প্রায় সকল নদ-নদীতেই ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩২০টি উল্লেখযোগ্য নদ-নদী রয়েছে। এ সকল নদ-নদীর মধ্যে মাত্র ৯০-১০০টিতে ইলিশ মাছ পাওয়া যায় (হালদার ২০০৩)।

সাম্প্রতিককালে বিলুপ্ত প্রায় ইলিশ মাছের আবাসস্থল

দেশের প্রধান ৪টি নদ-নদী যথা-পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র এবং এদের প্রায় সকল শাখা, প্রশাখা ও উপ-নদীতে পূর্বে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। এ ছাড়া ফেনী, কর্ণফুলী, মাতামুহুরী, ইত্যাদি নদ-নদী থেকে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে ইলিশ মাছ আহরিত হতো (আহসান উল্লাহ ১৯৬৪, হালদার ১৯৯২)। পূর্বে প্রায় সমস্ত ইলিশ মাছই (৯৫-৯৮%) দেশের অভ্যন্তরীণ নদী হতে আহরিত হতো। পঞ্চাশের দশকে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ১.৫ লক্ষ মে: টন। কিন্তু বর্তমান উৎপাদন মাত্র ৬০,০০০-৭০,০০০ মে: টন। সম্প্রতিকালে দেশের যে সব নদ-নদী হতে ইলিশ মাছ বিলুপ্ত হয়েছে বা বিলুপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তা পরীক্ষার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের মাধ্যমে দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion) করা হয়। উক্ত দলীয় আলোচনার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, বিগত ৩০/৩৫ বৎসরে বাংলাদেশের ৩৫টি নদ-নদী হতে ইলিশ মাছ বিলুপ্ত হয়েছে বা বিলুপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ সব নদ-নদী হতে এক সময় বছরে ১৫,০০০-১৬,০০০ নৌকা দিয়ে ২১,০০০-২৫,০০০ মেঃ টন ইলিশ মাছ আহরিত হতো। ইলিশ বর্তমানে দেশের মাত্র কয়েকটি নদ-নদীতে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া গেলেও তা অচিরেই বিলুপ্ত হবার আশংকা রয়েছে।

দেশের প্রধান নদ-নদীতে ইলিশ আহরণের বর্তমান অবস্থা

দেশের প্রধান ৪টি নদ-নদী হতে ইলিশ আহরণের বর্তমান অবস্থা পরিবীক্ষণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের, মৎস্য সম্পদ জরীপ পদ্ধতির ১৯৮৫-৮৬ সালের এবং ২০০১-০২ সালের ইলিশ উৎপাদন পরিসংখ্যানের তুলনামূলক পর্যালোচনা নিম্নরূপ ঃ

নদ-নদীর নাম	উৎপাদন (মে: টন)		১৯৮৫-৮৬ সালের তুলনায় উৎপাদন হ্রাস (মে: টন:)	উৎপাদন হ্রাসের শতকরা হার
	১৯৮৫-১৯৮৬	২০০১-২০০২		
ঊর্দ্ধ মেঘনা	৩৮০০	৫০০	৩,৩০০	৮৬.৯
নিঃ মেঘনা	৬৩,২০০	৩৯,৪০০	২৩,৮০০	৩৭.৭
ঊর্দ্ধ পদ্মা	৫০০	৩০০	২০০	৪০.০
নিঃ পদ্মা	১,৩০০	৭০০	৬০০	৪৬.২
যমুনা	৫০০	১০০	৪০০	৮০.২
ব্রহ্মপুত্র	১০০	১০	৯০	৯০.০
	৬৯,৪০০	৪১,০১০	২৮,৩৯০	৪১.০

টেবিল: বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী হতে আহরিত ইলিশ মাছের তুলনামূলক পর্যালোচনা

উপরের টেবিল হতে দেখা যায়, দেশের প্রধান ৪টি নদ-নদীতে ইলিশ আহরণের পরিমাণ বিগত ১৯৮৫-৮৬ সালের তুলনায় ২০০১-০২ সালে গড়ে প্রায় ৪১% হ্রাস পেয়েছে এবং এর মধ্যে নিঃ মেঘনায় ৩৭.৭%, ঊর্দ্ধ মেঘনায় ৮৬.৯%, ঊর্দ্ধ পদ্মা ৪০%, নিঃ পদ্মায় ৪৬.২%, যমুনায় ৮০.২% এবং ব্রহ্মপুত্রে ৯০% ইলিশের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এ সব নদ-নদীর ইলিশ মাছের উৎপাদন স্থায়িত্বশীল পর্যায়ে রক্ষা করা সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে ইলিশ উৎপাদনে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

ইলিশ আবাসস্থল ধ্বংস এবং উৎপাদন হ্রাসের কারণ

আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে ইলিশের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই ইলিশের আবাসস্থল যাতে বিনষ্ট না হয়, সেজন্য ইলিশের আবাসস্থল ক্ষতির বিষয়গুলো অবহিত হওয়া দরকার। ইলিশ মাছের আবাসস্থল ধ্বংস ও এর উৎপাদন হ্রাসের কারণ ও প্রভাব সংক্ষিপ্তভাবে নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ এবং আঁড়াআড়িভাবে নদীতে বাঁধ নির্মাণ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে দেশে প্রায় ৩.৩৬ মিলিয়ন হেক্টর প্লাবনভূমি ৭,০২৪ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন বাঁধ দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে এবং নদ-নদী ও সংযোগ খালের উপর ১০৬৫টি আড়াআড়ি বাঁধ নির্মান করা হয়েছে (এমপিও, ১৯৯০)। এত ব্যাপক সংখ্যক বাঁধ নির্মাণের ফলে ইলিশ আবাসস্থল

বহুলাংশে নষ্ট হয়। গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের ফলে সমুদ্র থেকে বলেশ্বর-নবগঙ্গা ও কালিগঙ্গা হয়ে কুমার ও পদ্মা নদীতে ইলিশের অভিপ্রয়াণ বন্ধ হয়ে গেছে (মাহমুদ, ১৯৯৪)। হুরা সাগর, করতোয়া, ইছামতি ইত্যাদি নদীতে বাঁধ নির্মাণের ফলে এ সব নদীতে এখন আর ইলিশ পাওয়া যায় না। ফেণী নদীর মুখে আঁড়াআড়ি বাঁধ দেয়ার ফলে বাণিজ্যিকভাবে প্রতি বছর আহরিত প্রায় ৫০০ মেঃ টন ইলিশ মাছ আর পাওয়া যাচ্ছে না (হালদার, ১৯৯২)। চাঁদপুর ও মেঘনা-ধনাগোদা সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, মধুমতি, ইছামতি ইত্যাদি প্রকল্প একই ভাবে দেশের ইলিশ সম্পদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

খ. ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব

ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে পদ্মা নদীতে পানি প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে, ফলে এ নদীর প্রায় সকল শাখা-প্রশাখা ভরাট হয়ে কোন কোনটি শুকিয়ে গেছে। যার প্রভাবে পদ্মাসহ এর সকল শাখা-প্রশাখায় ইলিশ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, কোন কোন নদী ইলিশ শূন্য হয়ে গেছে। বিগত ১৯৮৯-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ভারতের সাথে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ চুক্তি না থাকায় পদ্মা নদীর পানি প্রবাহ ব্যাপক ভাবে হ্রাস পায় এবং ইলিশ মাছের আহরণ পূর্বের কয়েক বৎসরের তুলনায় প্রায় ২৫.৮% কমে গেছে (হালদার এবং রহমান, ১৯৯৮)।

গ. পলিভরাট (Siltation)

নদ-নদীতে পলিভরাট অন্যান্য মৎস্য সম্পদের ন্যায় ইলিশের জন্যও মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। প্রতি বছর প্রায় ২,১৯৭ মিলিয়ন টন পলি গঙ্গা- ব্রহ্মপুত্র নদীসমূহের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে নিষ্কাশিত হয় (Curray এবং Moore, ১৯৭১)। একইভাবে মেঘনা নদীর মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পলি বঙ্গোপসাগরে পতিত হচ্ছে। হাতিয়া, সন্দীপ, ভোলা, নোয়াখালী অঞ্চলের প্রধান নদীসমূহের পাড় ব্যাপকভাবে ভাংগনের ফলে উক্ত অঞ্চলে নদীর গতিপথ এবং তলদেশের গঠন ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং অনেক চর ও ডুবো চরের সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ইলিশের আবাসস্থল নষ্ট, অভিপ্রয়াণ পথ বন্ধ এবং পরিবেশের পরিবর্তন করছে। ফলে ইলিশ মাছের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। পলি জমে ধলেশ্বরী, কালিগঙ্গা, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি নদীর উৎস মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ সব নদী নাব্যতা হারিয়েছে। একইভাবে সুরমা, কুশিয়ারা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদ-নদীতে পলি জমে প্রায় মৃত পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় এ সকল নদ-নদীতে ইলিশ আর পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘ. জলজ পরিবেশ দূষণ

সব ধরনের বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলা এ যেন বাংলাদেশে এক অঘোষিত প্রথা। তাছাড়া শিল্প-কারখানার বর্জ্য, সার ও কীটনাশকের বহুল ব্যবহার, নগর ও পৌর এলাকার ময়লা আবর্জনা প্রতিনিয়ত নদীসমূহকে দূষিত করছে। প্রতি বছর কৃষি জমি হতে প্রায় ২,৭৫০ মেঃ টন কীটনাশক (মোট ব্যবহারের ২৫%) ধৌত হয়ে জলাশয়ে পতিত হচ্ছে এবং নদীর পানি দূষণ করছে। এ দূষণ প্রক্রিয়া আমাদের দেশের নদ-নদীসহ উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক পরিবেশকেও আঘাত করছে (ESCAP ১৯৮৮)। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের ১৪৪টি বৃহৎ শিল্প কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য সরাসরি কর্ণফুলী নদী এবং বঙ্গোপসাগরে ফেলা হয়। খুলনা শহরের প্রায় সব শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য একইভাবে রূপসা নদী এবং উপকূলীয় অঞ্চলকে দূষিত করছে। আমাদের দেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদী নেপাল ও ভারত হয়ে আমাদের জলসীমায় প্রতিনিয়ত দূষণকারী পদার্থ বয়ে নিয়ে আসছে। ফলে বাংলাদেশের জলজ পরিবেশ দূষণ অদূর ভবিষ্যতে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

ইলিশ মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপায়

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, ইলিশ মাছের আবাসস্থলের এক বিরাট অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং এখনো বিভিন্নভাবে ইলিশের আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে। সেচ প্রকল্প ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং নদ-নদীতে আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ইলিশের বিচরণ বন্ধ হওয়ার ফলে ইলিশের উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পলিভরাটে ইলিশের অভিপ্রয়াণ পথ রুদ্ধ করেছে এবং জলজ দূষণ ইলিশের বিচরণ এবং প্রজনন বিঘ্নিত করছে। এমতাবস্থায়, ইলিশ মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরী।

ক. বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে করণীয়

- নূতন কোন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণের পূর্বে ইলিশ সম্পদের ওপর এর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবের আলোকে যথাযথ সংরক্ষণ

ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ পথ ও অন্যান্য মাছের চলাচলের পথ মুক্ত রাখা।

- ইলিশ ও অন্যান্য মাছের অভিপ্রয়াণ, নৌ-চলাচল এবং সেচ কার্যক্রমের জন্য পদ্মা, ধলেশ্বরী, মধুমতি, গড়াই নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি ও অব্যাহত রাখার জন্য উল্লেখিত নদীসমূহের তলদেশ খনন করে সংস্কার করা।
- মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে ইলিশ মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, নদী-শাসন ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল কর্তৃপক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর-এর সংগে সমন্বিতভাবে কাজ করা।
- মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উল্লেখিত ক্ষতিগ্রস্থ আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়, তথ্য বিনিময় ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ এবং এর প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. পলিভরাট নিয়ন্ত্রণ

দেশের নদ-নদীতে ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য নদী খনন করে পলিভরাট নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

- পলিভরাট নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশব্যাপী বিশেষ করে দেশের উত্তর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

গ জলজ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- নদী, মোহনা এবং সমুদ্রের পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে অপরিকল্পিতভাবে জলজ পরিবেশে বিভিন্ন বর্জ্য, রাসায়নিক পদার্থ, কলকারখানার বর্জ্য ফেলা রোধ করা প্রয়োজন।
- মৎস্য অধিদপ্তরকে পরিবেশ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে একযোগে কাজ করা; প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।
- দূষণ মাত্রা বিশ্লেষণ এবং যথাযথ বর্জ্য শোধন প্রক্রিয়া ছাড়া নতুন কলকারখানা স্থাপন বা নিবন্ধন না করা।
- কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (IPM) চালু করা।
- জলজ পরিবেশ দূষণ মোকাবিলা করার জন্য ESCAP (১৯৮৮) প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ ও প্রয়োগ করা।

আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইলিশ মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বর্ণিত সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে ইলিশ সম্পদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ইলিশ মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নিমিত্তে এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশে ইলিশ মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা
(Galda Hatchery Management)

মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract
Prawn hatchery is mainly to rare the larvae to post larvae. Larval rearing starts normally when the berried prawn available in the hatchery. If the prawn culture done in the pond throughout the year berried can be found in at least 10% So on the availability of berried, the time of larval rearing can be set. Storage tank, mixing tank, holding tank, larvae release tank, larvae rearing tank in a covered area under close environment are required to produce PL of Golda. Brine from salt bed, fresh water from local source with proper treatment should be used for larval rearing. The stocking of larvae is done in 50 thousand/MT of water. If the management is better, the number of larvae can go up to 100 thousand/MT. After 7 days with artemia, prepared custard feed with measured micron 200~100 is applied in the hatchery. About 28-30^{0}C temp. is moderate for hatchery water. Only protozoa attack is found seldom which can be controlled by formalin with 10 P.P.M. It takes 25-30 days from larvae to post larvae, sometime 45 days depending on temperature & management technique

গলদা চিংড়ির হ্যাচারি
রুইজাতীয় মাছের মত গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজনন করার মত কোন কার্যক্রম নাই। কারণ চিংড়ির প্রজনন রুইজাতীয় মাছের চেয়ে ভিন্নতর। গলদা চিংড়ির হ্যাচারিতে মূলতঃ লার্ভা পালন করা হয়। প্রকৃতিতে গলদা চিংড়ি যে পরিবেশে লার্ভা ছাড়ে সে ধরণের পরিবেশ তৈরি করে হ্যাচারিতে লার্ভার ১১টি স্তর পর্যন্ত পালন করে পোষ্টলার্ভা (পি, এল) এ রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লার্ভা পালন করা হয় গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ি হ্যাচারি সাধারণতঃ বাংলাদেশের বৈচিত্রময় আবহাওয়ার কারণে সম্পূর্ণ বদ্ধভাবে (Closed) করতে হয়। বাতাস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবস্থাপনা উন্নত হতে হয়।

হ্যাচারির কার্যক্রম
প্রকৃতিতে যখন প্রচুর বেরিড চিংড়ি পাওয়া যায় তখন থেকেই হ্যাচারিতে লার্ভা পালন কাজ শুরু হয়। আবহাওয়ার তারতম্য ভেদে তা মার্চ-এপ্রিলে শুরু হয়ে জুলাই পর্যন্ত চলে। তবে ইচ্ছা করলে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় বেরীড পাওয়া স্বাপেক্ষে সারা বছরই হ্যাচারিতে উৎপাদন করা সম্ভব। সাধারণ নিয়মে চাষকৃত পুকুরে ১০ ভাগ চিংড়ি বেরিড থাকার কথা। আশা করা যায় পুকুরে চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হলে সারা বছর হ্যাচারির কার্যক্রম করা যাবে।

হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের চৌবাচ্চা
সাধারণতঃ হ্যাচারি কতগুলি চৌবাচ্চার সমাহার। ১) ষ্টোরেজ ট্যাংক, ২) মিক্সিং ট্যাংক, ৩) হোল্ডিং ট্যাংক, ৪) লার্ভা রিলিজ ট্যাংক এবং ৫) লার্ভাল রেয়ারিং ট্যাংক। হ্যাচারির ধারণ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে চৌবাচ্চার সংখ্যা নিরূপিত হয়। তবে এল আরটি (লার্ভা রেয়ারিং ট্যাংক) পাত্রটির পানি ধারণ ক্ষমতা ৩-৫ টন হলে ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধা হয়। চৌবাচ্চার চারিদিকে চলাফেরার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। চারদিকে সম্ভব না হলে কমপক্ষে তিনদিকে চলাচলের ব্যবস্থা রাখা দরকার। তলদেশের কোণাসমূহ সমতলভাবে গোলাকার করে দিতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই কোন ময়লা জমতে না পারে। চৌবাচ্চাসমূহ আরসিসি দিয়ে তৈরি হলে ভাল হয়। নির্মাণের সময় কমপক্ষে ২০ ভাগ পাডল্যা সিমেন্ট মিশাতে হবে। চৌবাচ্চার ভিতরের আস্তরে নেট ফিনিশিং না দিয়ে সাধারণভাবে ফিনিশিং দিতে হবে। পরে রং দিয়ে একেবারে পানি নিরোধক করে ফেলতে হয়।

বাতাস ব্যবস্থাপনা
গলদা চিংড়ি হ্যাচারির প্রাণ হলো বাতাস ব্যবস্থাপনা। ব্লোয়ারের সাহায্যে সার্বক্ষণিক বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ সার্বক্ষণিক পাওয়া যায় না। তাই হ্যাচারির জন্য ষ্ট্যান্ডবাই জেনারেটর রাখা অত্যাবশ্যক। তারপরেও ব্যাটারি চালিত এরেটর এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ লার্ভাসমূহ এত নাজুক যে, অল্প সময় বাতাস না পেলে মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

পানি ব্যবস্থাপনা

১০-১২ পিপিটি পানির জন্য লবণ ক্ষেত থেকে পানি সংগ্রহ করে ষ্টোরেজ ট্যাংকে মওজুদ রাখতে হয়। সাধারণতঃ লবণ ক্ষেতের ৪র্থ ও ৫ম স্তর থেকে পানি নিতে হয়। স্থানীয়ভাবে স্বাদু পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হয়। পানির হার্ডনেস বিশেষ করে লবণ পানি মিশ্রণ এর পূর্বে স্বাদু পানির হার্ডনেস ১০০ পিপিএম এর নিচে নিয়ে আসতে হবে। এ কাজটি ২০ পিপিএম চুন দ্বারা করা যায়। প্রয়োজনে একাধিক বার চুন প্রয়োগ করে হার্ডনেস কমাতে হবে। মিক্সিং ট্যাংকে পরিমাণ মতো লবন পানি (ব্রাইন) ও স্বাদু পানি দিয়ে মিশ্রণ সম্পন্ন করতে হবে যাতে করে পানির লবণাক্ততা ১০-১২ পিপিটি মাত্রার হয়। তারপর ৬৫% ক্লোরিন সম্পন্ন ব্লিচিং পাউডার ২০ পিপিএম হারে প্রয়োগ করে এরেশন দিয়ে ১২-২০ ঘন্টা রাখতে হবে। তারপর দেখতে হবে পানিতে ক্লোরিন আছে কিনা। থাকলে আরো বাতাস দিতে হবে অথবা ২০ পিপিএম হারে সোডিয়াম থায়োসালফেট ব্যবহার করে ক্লোরিনমুক্ত করতে হবে। এ পরিশোধিত পানি লার্ভা প্রতিপালনের জন্য এলআর ট্যাংকে মজুদ রাখা হয়। লার্ভা মজুদের আগে ২০ পিপিএম হারে ইডিটিএ-২এনএ প্রয়োগ করে নিতে হবে। প্রতি ২/৩ দিন পর পর ১০ ভাগ পানি তলদেশ থেকে পরিবর্তন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ব্যবহৃত পানি ফেলে না দিয়ে ষ্টোরেজ ট্যাংকে মজুদ রাখলে পরিশোধনের মাধ্যমে তা পুনঃ ব্যবহার করা যায়।

লার্ভা মজুদ

এলআরটিতে প্রতি টন পানিতে ৫০ হাজার পর্যন্ত লার্ভা মজুদ করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে ১ লক্ষ পর্যন্ত লার্ভা মজুদ করা যেতে পারে।

খাবার সরবরাহ

সাধারণত লার্ভা রিলীজ এর ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত কোন খাবার প্রয়োজন হয় না। লার্ভার অবস্থা দেখে পূর্বাহ্নেই আর্টিমিয়া ডি-ক্যাপ করার কাজ শুরু করতে হবে। ২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হবার পর প্রতি লার্ভার জন্য ২-৩টি হারে আর্টিমিয়া ৭-৮ দিন প্রতি ২ ঘন্টা পরপর সরবরাহ করতে হবে। ৮ দিনের পর তৈরি কাষ্টার্ড প্ল্যাংকটন নেট দিয়ে ভাল করে চেলে ১৫০ মাইক্রন আকার থেকে ১০০ মাইক্রন আকার পর্যন্ত সরবরাহ করতে হবে। তবে কাষ্টার্ড খাবার প্রথমে অল্প করে দিয়ে অভ্যাস করানোর পর খাবার বাড়াতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে খাবার যেন কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত না হয়।

তাপমাত্রা

আমাদের দেশে মার্চ-মে মাস পর্যন্ত তাপমাত্রা মোটামুটি এক রকম থাকে। তবে অনেক সময় অত্যধিক বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা কম বেশি হয়। গলদা চিংড়ির লার্ভা ৩-৪° তারতম্যের বেশি সহ্য করতে পারেনা। তাই সে রকম সম্ভাবনা থেকে রেহাই পাবার জন্য থার্মোষ্ট্যাট হীটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাপমাত্রা ২৮-৩০° সেঃ এ নির্দিষ্ট করে হীটার জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এতে তাপমাত্রা তারতম্যের যে ক্ষতিকর সম্ভাবনা থাকে তা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

রোগবালাই

সাধারণতঃ হ্যাচারিতে রোগবালাই হলে ঐ ফসল ত্যাগ করাই ভাল। তবে যদি অল্প স্বল্প প্রোটোজোয়ার আক্রমণ হয় বিশেষ করে জু-থামোনিয়া আক্রমণ হলে ২০পিপিএম হারে ফর্মালিন ব্যবহার করলে এ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে সাইফনিং ও খাবার যদি না জমে অর্থাৎ ময়লা না জমলে কোন রোগ হবার সম্ভাবনা থাকেনা। অপারেটরসহ সকল প্রবেশকারী তার হাত,পা ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। তবে ব্যাপক দর্শনার্থী হ্যাচারিতে ঢুকতে না দেয়াই ভাল।

লার্ভা থেকে পোষ্ট লার্ভা

সব কিছু ঠিক থাকলে সাধারণতঃ ২৫-৩০ দিনে লার্ভা থেকে পোষ্ট লার্ভাতে রূপান্তরিত হয়। অনেক সময় খারাপ ব্যবস্থাপনার কারণে ৪৫ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। পোষ্ট লার্ভা বা পিএল হবার পর ২৪ ঘন্টা সময় নিয়ে ১২ পিপিটি থেকে ০ পিপিটিতে পানির লবণাক্ততা আনতে হবে। যে ট্যাংকে পিএল রাখা হবে সেখানে জাল টানিয়ে দিতে হবে যাতে পিএল জালের গায়ে লেগে থাকতে পারে কারণ পিএল কোন কিছুতে ঝুলে থাকতে পছন্দ করে।

পি এল উৎপাদনের আয় ব্যয়ের বিবরণঃ

২০ লক্ষ পি এল উৎপাদনের ব্যয় ও আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

(ক) মূলধন ব্যয় ঃ	
হ্যাচারিতে সেড নির্মান	১০,০০,০০০.০০
যন্ত্রপাতি	১০,০০,০০০.০০
পরিচালন ব্যয়	৫,০০,০০০.০০
মোট ব্যয়-	২৫,০০,০০০.০০
২য় বর্ষে আয় ঃ	
২০ লক্ষ পি এল এর মূল্য (@১.০০/ পি এল)	২০,০০,০০০.০০
তয় বর্ষে আয় ঃ	
২০ লক্ষ পি এল এর মূল্য (@১.০০/ পি এল)	২০,০০,০০০.০০
মোট আয়-	৪০,০০,০০০.০০
মোট লাভ	৪০,০০,০০০.০০
(-মোট ব্যয়)	২৫,০০,০০০.০০
নীট লাভ-	১৫,০০,০০০.০০

ব্রুড মাছ উন্নয়নে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প
(Brood Bank Establishment Project For Brood Fish Development)

বেগম আনওয়ারী
মোঃ অহিদুজ্জামান
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract

Bangladesh is an agro-based country. The fisheries sector is contributing towards its economic development, poverty alleviation, earning of foreign exchange and as a prime source of animal protein supply. For wide spread development of this sector, the production of quality seed and their uninterrupted supply to producer level is a pre-requisite. Earlier fish spawn and fingerlings were abundant in natural breeding grounds. Now a days, most of the natural spawning grounds are almost destroyed. On the other side, the demand of fingerling and fry has been increasing gradually. The fish seed production capacity is increased but the quality is deteriorated in genetically. The quality of fish seed deteriorated due to ignorance and lack of knowledge in scientific brood management techniques, inbreeding and intentional hybridization for making more profit. At present inbreeding is the main problem for quality fish seed production. Genetically pure brood in induced breeding play a vital role for producing pure spawn and fingerlings and ultimately for increased fish production. To strengthen the national economy and to overcome the above mentioned problems Brood Bank Establishment Project has been implementing under DoF. The Project is now working to produce 110 metric tons of genetically improved brood fish, 1800 kg quality spawn and 0.5 million genetically improved fingerlings.

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপুল জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভাবনাময় এ খাতের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উন্নতমানের বীজ বা পোনা উৎপাদন এবং তা মাছ উৎপাদনকারীদের সরবরাহ করা। বীজ ভাল না হলে যেমন ফসলের ফলন ভাল হয় না, তেমনি পোনা গুণগতমান সম্পন্ন না হলে পুকুর বা জলাশয়ে মাছের ফলনও আশানুরূপ পাওয়া যায় না। অতীতে প্রাকৃতিক উৎস হতে রুইজাতীয় মাছের রেণু সংগ্রহ করে পোনা উৎপাদন করা হতো। কিন্তু নানাবিধ কারণে এ উৎস থেকে আহরণ কমে গিয়েছে। অপর দিকে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ব্যাপকতার জন্য মাছ চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় রেণু পোনার চাহিদা বেড়েছে। এ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দেশে সরকারী এবং বেসরকারী হ্যাচারি মিলিয়ে সাত শতাধিকের উর্ধে হ্যাচারি গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র ইতিমধ্যে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনই হলো পোনা প্রাপ্তির প্রধান উৎস। কৃত্রিম প্রজননের জন্য উন্নতমানের গুণসম্পন্ন ব্রুডই হলো ভাল পোনা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। মাছের কৃত্রিম প্রজনন দেশে রেণু ও পোনা প্রাপ্তিতে বিশেষ অবদান রাখছে। রেণু পোনা উৎপাদনে পরিমাণগত অগ্রগতি হলেও এর গুণগত মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। গুণগত বৈশিষ্ট্যের অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে ব্রুড মাছের বিজ্ঞান ভিত্তিক নির্বাচন ও পরিচর্যার অভাব, অন্তঃপ্রজনন সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অধিক মুনাফা লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অনাকাঙ্খিত সংকরায়ন এবং অপরিপক্ক মাছের কৃত্রিম প্রজনন। ফলে পোনার কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অবনতি হওয়ায় মৎস্য চাষিরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যা মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। ইদানিং হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার উৎপাদনশীলতা হ্রাস, দৈহিক বিকৃতি, রোগবালাই এবং ব্যাপক মৃত্যুহার সম্পর্কে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এতে ধারনা করা হচ্ছে যে, পোনা উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন, প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ মাছ বাছাইয়ে অসচেতনতা (অর্থাৎ

ঋণাত্মক নির্বাচন প্রবণতা) এবং অপরিকল্পিত সংকরায়নজনিত কারণে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারিগুলোতে উৎপাদিত পোনার গুণগতমান দিন দিন কমে যাওয়ার পেছনে মৎস্য বিজ্ঞানীরা যে কারণটিকে বিশেষভাবে দায়ী করছেন তার মধ্যে অন্তঃপ্রজনন হলো অন্যতম। বংশগতভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্ত্রী ও পুরুষ মাছের প্রজননকে অন্তঃপ্রজনন বলা হয়। হ্যাচারীতে এ সমস্যা দু'ভাবে হতে পারে-

- বংশগতভাবে অতি ঘনিষ্ঠ ব্রুড মাছের প্রজনন ঘটানোর মাধ্যমে।
- একই ব্রুড থেকে উৎপাদিত ভাই-বোন সম্পর্কীয় পোনা বড় করে এদের মধ্যে প্রজননের ফলে।

অন্তঃপ্রজননের ফলে কৌলিতাত্ত্বিক সমসত্বতার মাত্রা (Degree of Homozygosity) বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কৌলিতাত্ত্বিক অসমসত্বতার (Degree of Heterozygosity) মাত্রা কমতে থাকে। কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, ভাই-বোন সম্পর্কীয় মাছের মধ্যে প্রজননে এক জেনারেশনেই সব গুণাগুনের শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পায়। জেনারেশন থেকে জেনারেশনে অবক্ষয়ের এ ধারা চলতে থাকে। অনুরূপভাবে মা ও ছেলে এবং মেয়ে ও পিতা সম্পর্কীয় মাছের মধ্যে প্রজননেও কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় দেখা দেয় অর্থাৎ পিতা-মাতা বংশগতভাবে যতটা ঘনিষ্ঠ হবে পরবর্তী বংশধরের উপর কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয়ের প্রভাবের মাত্রা তত বেশি হবে। ফলে মাছের উৎপাদনশীলতা হ্রাস, বিকলাংগতা, রোগ বালাইয়ের সমস্যা, ডিমের সংখ্যা (Facundity) কমে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা দেখা দিবে। তাছাড়া ব্রুডমাছের ঋণাত্মক নির্বাচন প্রবণতা (Negative selection), অপরিকল্পিত সংকরায়ন, অপরিণত (Immature) মাছের প্রজনন ইত্যাদি কারণেও উৎপাদিত পোনা শারীরিকভাবে দুর্বল হয় যা অধিক হারে পোনা মৃত্যুর কারণ সহ কাঙ্খিত ফলন দিতে ব্যর্থ হয়।

সর্বনিম্ন যে ওজন এবং বয়সের মাছকে হ্যাচারিতে প্রজননের জন্য নির্বাচন করা উচিত তা নিম্নরুপ-

প্রজাতি	সর্বনিম্ন বয়স	সর্বনিম্ন ওজন (কেজি)
কাতলা	৩+	৪+
রুই	২+	১.৫+
মৃগেল	২+	১.৫+
কালিবাউশ	২	১+
সিলভারকার্প	২+	২+
গ্রাসকার্প	২+	৩+
কমনকার্প	১+	১.৫+
ব্লাককার্প	৫+	৬
সরপুটি	১	০.৫+

উপরোক্ত সমস্যাগুলো নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ৪র্থ মৎস্য প্রকল্প ও বিশেষ করে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প সারাদেশে ৬টি বিভাগের ১২টি হ্যাচারি/খামারে প্রাকৃতিক উৎসের রেণু সংগ্রহ করে উন্নতমানের ব্রুড উৎপাদন পূর্বক সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের নিকট স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করছে। তাছাড়া প্রকল্প হতে প্রাকৃতিক উৎসের উন্নত ব্রুড উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে হ্যাচারি মালিক/অপারেটরদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্পের আওতাধীন হ্যাচারি/খামারের তালিকা

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলা	হ্যাচারি/খামারের নাম ও অবস্থান
১.	রাজশাহী	নাটোর	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, নাটোর সদর, নাটোর।
২.		জয়পুরহাট	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
৩.	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।
৪.		কিশোরগঞ্জ	কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ।
৫.	খুলনা	মাগুরা	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, মাগুরা সদর, মাগুরা।
৬.		ঝিনাইদহ	কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।

৭.	চট্টগ্রাম	বি-বাড়ীয়া	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বি-বাড়িয়া সদর, বি-বাড়িয়া।
৮.		কুমিল্লা	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
৯.	সিলেট	হবিগঞ্জ	কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স, কুর্শি, নবীগঞ্জ,হবিগঞ্জ।
১০.		সুনামগঞ্জ	কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
১১.	বরিশাল	পটুয়াখালী	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।
১২.		ঝালকাঠি	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।

ব্রুড মাছ উৎপাদনে নদী উৎসের রেণু পোনা ব্যবহার

উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদনে সফলতার প্রাথমিক শর্ত হলো প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করা। মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদনের নিমিত্তে প্রাকৃতিক উৎস তথা নদী থেকে খাঁটি রেণু সংগ্রহ করতে হবে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে খাঁটি রেণু পোনা সংগ্রহের কাজটি খামার/হ্যাচারি ব্যবস্থাপকদের নিজ দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানেই করতে হবে। নদী থেকে রেণু সংগ্রহ পূর্বক নার্সারি পুকুরে লালন পালনের পর দ্রুত বর্ধনশীল পোনা আলাদা করে ব্রুডমাছ হিসেবে প্রতিপালন করা উত্তম। এ প্রক্রিয়ায় ২/৩ বছর অন্তর অন্তর প্রাকৃতিক উৎস/নদী থেকে রেণু সংগ্রহ করে ব্রুড উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বিদ্যমান ব্রুড স্টক থেকে খুব বয়স্ক, দুর্বল স্বাস্থ্যের রোগাক্রান্ত কিংবা কমবৃদ্ধির হার সম্পন্ন ব্রুড বাতিল করে নতুন স্টক দিয়ে পূরণ করতে হবে। ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প এ লক্ষ্যে ২০০২ ও ২০০৩ সালে হালদা, পদ্মা ও যমুনা নদী থেকে প্রাকৃতিক উৎসের রেণু সংগ্রহ করে সারা দেশে প্রকল্পাধীন ১২টি হ্যাচারি/খামারে ১১০ মেঃ টন ব্রুড উৎপাদনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৮৫ মেঃ টন ব্রুড উৎপাদন হয়েছে যা থেকে প্রকল্পের নির্ধারিত মূল্যে সরকারি/বেসরকারি হ্যাচারিতে প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুড সরবরাহ করা হয়েছে। নিজস্ব উৎপাদিত ব্রুড দ্বারা প্রকল্পভূক্ত খামার/হ্যাচারি থেকে প্রায় ৫০০ কেজি রেণু উৎপাদন করা হয়েছে।

বিশেষ করে ব্রুডমাছ উন্নয়নকালীন সময়ের কমপক্ষে প্রথম তিন বৎসর হ্যাচারি/খামার সমূহে কৌলিতাত্ত্বিক কার্যক্রমকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কোনক্রমেই বাণিজ্যিক লক্ষ্যমাত্রা রাখা চলবে না । যদি অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা থাকে তাহলেই বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত ব্রুড উৎপাদন কৌশল নিম্নরূপঃ

- প্রথমে হালদা নদী থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করে রায়পুর মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নার্সারিতে লালন পালন করা হয়।
- পদ্মা, যমুনা ও অন্যান্য নদীর রেণু নির্দিষ্ট কয়েকটি খামারে (নাটোর, কটিয়াদি, কোটচাঁদপুর) সংগ্রহ করে নার্সারিতে লালন পালন করা হয়।
- নির্দিষ্ট রেণু বিজ্ঞানসম্মতভাবে নার্সারিতে লালন পালন করার পর কয়েকটি ধাপে পোনা থেকে ২ বছরে ২ কেজি ওজনের ব্রুড উৎপাদনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রথম ধাপে সংগৃহীত পোনা নার্সারি পুকুরে ৩৫-৪০ দিন লালন পালনের পর ২-৩ সেঃ মিটার হলে তা থেকে দ্রুত বর্ধনশীল পোনা বাছাই করে হ্যাচারি/খামারে সরবরাহ করা হয়। এ প্রকল্পে খামারগুলোর প্রজাতি (সংখ্যা) ভিত্তিক ব্রুড উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার অন্তত ১০ গুণ পোনা সরবরাহের কৌশল অবলম্বন করা হয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে লালনকৃত পোনাকে আরো ২/৩ মাস বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচর্যা করে ১০-১২ সেঃ মিটার আকারের পোনা থেকে ৫০% সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল, সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন পোনা বাছাই পূর্বক আলাদা পুকুরে মজুদ করা হয়।
- তৃতীয় পর্যায়ে আরো ৩/৪ মাস আলাদা পুকুরে লালন পালনের পর সকল পোনা আহরণ করে তা থেকে পুনরায় ১০০-১৫০ গ্রাম ওজনের সবচেয়ে ভাল এবং সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন পোনা/মাছ বাছাই করা হয়। পরে এগুলো ব্রুড উৎপাদনের জন্য পুকুরে মজুদ করা হয়। অর্থাৎ এ ধাপ পর্যন্ত আসতে প্রতি ১০টি পোনা থেকে ভাল ও দ্রুত বর্ধনশীল, সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন ১টি পোনা ব্রুড উৎপাদনের নিমিত্তে বাছাই করা হয়। এ ভাবে সর্বশেষ ধাপে প্রতি ১০টি পোনা থেকে ১টি

পোনা ব্রুড মাছের পুকুরে মজুদ করা হয়। এই পোনা মজুদ পুকুরে ২ বছর লালন পালনের পর গড়ে প্রায় দু' কেজি ওজনের হলেই কেবল রেণু পোনা তৈরীর জন্য ব্রুড হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

- প্রাকৃতিক উৎসের রেণু পোনা থেকে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প উপরোক্ত পদ্ধতিতে উন্নত ব্রুড উৎপাদন করে আসছে। তাছাড়া সিলভার কার্প এর ব্রুড উন্নয়নের জন্য পার্বতীপুর হ্যাচারী থেকে উন্নত জাতের প্রথম জেনারেশনের পোনা সংগ্রহ করে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্পাধীন খামার সমূহে পোনা সরবরাহ করা হয়। ১০ ঃ ১ হারে অর্থাৎ প্রতি ১০টি পোনা থেকে দ্রুত বর্ধনশীল ও সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন ১টি পোনা বাছাই করে ব্রুড তৈরি করা হয়। নদী থেকে সংগৃহীত পোনা থেকে কিছু চিতল, কালিবাউশ এর ব্রুড কটিয়াদী কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্সে একই পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা হয়। তাছাড়া কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারির উৎপাদিত ব্লাক কার্পেও পোনা থেকে কটিয়াদি সহ কয়েকটি খামারে ব্রুড তৈরির কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে ৩ বছর বয়সের এসব ব্লাক কার্পের গড় ওজন কোন কোন খামারে ১০-১২ কেজি পর্যন্ত হয়েছে। ব্রুড মাছ উৎপাদনের এ প্রক্রিয়াটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্পটি আগামী জুন/২০০৬ এ শেষ হতে যাচ্ছে। দেশের অন্তঃপ্রজনন সমস্যা সমাধানকল্পে এবং গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুড উৎপাদনের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম চালু রাখা প্রয়োজন। উৎপাদনের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেই ভবিষ্যতে উন্নত ব্রুড ও পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকবে। মৎস্যচাষীরা মাছ উৎপাদনে আগ্রহী হবে। ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্পের মেয়াদ শেষে পুনরায় উন্নত ব্রুড উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখতে না পারলে আগামীতে উন্নত ব্রুড মাছ পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে পড়বে। তাই কিছু খামার/হ্যাচারি নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র ব্রুড উৎপাদনের কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

সতর্কতা ঃ

- প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু পোনা সংগ্রহ করার সময় অবশ্যই উৎসস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে।
- প্রতিটি ধাপে মাছ বাছাইয়ের সময় মাছ যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সে ব্যাপারে খামার ব্যবস্থাপকগণকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- প্রতিটি পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পুকুর প্রস্তুতি, মাছের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে।

উপরে বর্ণিত ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট হারে পোনা এবং মাছ বাছাই করাই কৌলিতাত্ত্বিক ব্রুডমাছ উৎপাদনের আদর্শ পদ্ধতি। তাছাড়া নদী/প্রাকৃতিক উৎসের রেণু থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ব্রুড উৎপাদনের পর উপরোক্ত ব্রুড হ্যাচারিতে নির্বাচিত এবং লাইন ক্রসিং পদ্ধতি অনুসরণ করে উন্নত ব্রুড উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া যায়।

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়নে মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমিকা
(Role of Aquaculture Development Project (IFAD) in of Poverty Alleviation, Employment Generation and Empowerment of Women)

ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দিন
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract
The project area covers 476 selected villages of 42 upazilas (8 districts) of central western part of Bangladesh. This paper briefly describes the working strategies and activities implemented for poverty alleviation of project beneficiaries. The major working strategies are awareness raising, motivation, institutionalization of poor men and women and their access to the productive resources, skill development, micro-credit support, capital formation and technological interventions which generated part-time employment of >50,000 households beneficiaries. A total of 15600 pond aquaculture group (PAG) members (100% women) are working in 986.23 ha of pond of their own or leased. The participation of poor women to the productive resources and profitable economic activities encourages them to become socially empowered and self sustained. Total 1500 lake fishing group (LFG) members are managing 602 ha baors for scientific fish culture. Total 220 hh destitute women have been included as labor contracting society (LCS) member for the maintenance of community based infrastructure and plantation in the project area. A total of 30,375 community development group (CDG) members have been working (100% women) on different IGAs. They have been trained and supported by micro-credit of Taka 4000-5000 per hh. in average. About 27 types of IGAs have been identified including fish culture, poultry & dairy rearing, homestead gardening, small cottage industries, handicrafts, tailoring, glossary shop, other petty trades etc. Total house-hold income of beneficiaries increased more than 15% within a year of operation. The access of poor to the productive resources has been enhanced through awareness raising, motivation, group formation, organizational strengthening governed by a set of by-laws introduced by the project for beneficiary groups. Eight partner NGO's and one Lead NGO have been working and equipped to continue the project work with the beneficiary groups for next 15 years which may be extended up to 40 years if found suitable by GoB after expiry of the project period so as to ensure sustainability.

ভূমিকা
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ আত্মকর্মসংস্থান, প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মাছচাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক মাছ উৎপাদন কার্যক্রম বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। অধিক মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি সরবরাহসহ সমাজ জীবন উন্নীত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনা। দারিদ্র্য দূরীকরণ, আত্মকর্মসংস্থান ও গ্রামীণ জীবন উন্নত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনার মাঝে মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প একটি অন্যতম কর্মপ্রয়াস। এটি আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)এর অর্থায়নে ৮ বৎসর (১৯৯৮-২০০৫) মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য
- নির্বাচিত সুফলভোগীদের সংগঠিত এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা সুফলভোগীদের কাছে পৌছানো।

- সঠিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বাড়িয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারি সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি করা।
- বাঁওড় ও পুকুর সংস্কার করে মাছচাষ সহ নানাবিধ আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- বাঁওড় ও পুকুর সংস্কার করে অধিক হারে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা। উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাত করা এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নয়ন করা।

প্রকল্প এলাকা

বাংলাদেশের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর জেলার ৪২টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব উপজেলার ৬০০০টি গ্রাম থেকে জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ ৪৭৬টি গ্রামে এ প্রকল্পের কার্যক্র হচ্ছে।

সুফলভোগী

প্রকল্প এলাকার ৪৭৬টি গ্রামের নির্বাচিত বাঁওড় ও পুকুরের সন্নিকটে বসবাসকারী মৎস্য পেশায় নিয়োজিত এবং অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের এক হেক্টরের বেশি জমি নেই এবং বাৎসরিক আয় অনধিক ৩০ হাজার টাকা, তারা এ প্রকল্পের সুফলভোগী। এ ধরনের মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ২,৬৭,০০০। সুফলভোগীরা মোট ২,১৫৯টি দলে বিভক্ত এবং ৪৭,৬৯৫টি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে বাঁওড়ে মৎস্য আহরণকারী ১২০টি পুরুষ দলের ১৫০০টি পরিবার, ৭৮০টি পুকুর মৎস্যচাষী মহিলা দলের ১৫,৬০০টি পরিবার এবং ১,২১৫টি সমাজ উন্নয়ন মহিলা দলের ৩০,৩৭৫টি পরিবার। এছাড়া ৪৪টি শ্রমজীবী দুস্থ মহিলা দলের ২২০টি পরিবার সুফলভোগীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য যে, অত্র প্রকল্পের ৪৭,৬৯৫টি সুফলভোগী পরিবারের মধ্যে ৪৬,১৯৫টি মহিলা পরিবার রয়েছে। মহিলা সদস্যদের আনুপাতিক হার শতকরা ৯৬.৪৬ ভাগ।

মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকৌশল

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্রতার হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- চিহ্নিত সুফলভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- প্রাতিষ্ঠানিক দলের আকারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিকভাবে সংগঠিত করা
- উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা
- প্রশিক্ষণ ও লাগসই প্রযুক্তির বিস্তার করা
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করা
- মাছচাষ ও অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা

উন্নয়ন সহযোগী এনজিও

প্রকল্পের ফলাফল সুফলভোগীর নিকট পৌছানোর লক্ষ্যে আটটি জেলার জন্য স্থানীয় আটটি সহযোগী এনজিও এবং একটি প্রধান এনজিও নিয়োগ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে এসব এনজিওদের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে নিয়োজিত এনজিওগুলো নিজ নিজ জেলায় প্রতিষ্ঠিত ও কর্মরত বিধায় প্রকল্পের কার্যক্রম প্রকল্প শেষেও এর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

প্রকল্প এলাকার অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্যচাষসহ আরো ২৬টি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এর মধ্যে মূল কার্যক্রমগুলো হলো ঃ হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, শাকসব্জী চাষ, হস্ত শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং ভ্যান-রিক্সা ক্রয় করে ভাড়া দেয়া ইত্যাদি। এসব আয়বর্ধক কাজের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প থেকে এনজিওদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর ইত্যাদির ব্যবস্থাসহ উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা

সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত সুফলভোগীগণ মাছচাষ সহ অন্যান্য আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য যাতে ক্ষুদ্র সহায়তা পেতে পারে তার নিশ্চয়তা প্রদান করা এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্র প্রকল্পে ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি রয়েছে।

এ ঋণ কার্যক্রম সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত এনজিওদের দ্বারা সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। জুন ২০০৫ ইং পর্যন্ত ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা ৪৬,৪৬৪টি পরিবারে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

মাছচাষির চাহিদার ভিত্তিতে এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকৌশল অবলম্বন করেছে। মাছচাষ সম্প্রসারণ এবং আয়বর্ধক কর্মসূচির উদ্দেশ্য অর্জনে প্রশিক্ষণকে অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে ১৫,৬০০ জন পুকুর মৎস্যচাষি দলের সকল সদস্যকেই পুকুরে মাছচাষ বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার সকল সদস্যই মহিলা। তাছাড়া পুকুর মৎস্যচাষি দলের ১৫,৬০০ জন মহিলা সদস্যকে ১ দিনের ফলোআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং আগামীতেও ফলোআপ প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে। পুকুরে মৎস্যচাষ, বাঁওড় মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, দল গঠন ও ব্যবস্থাপনা, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক কর্মসূচি, ধানক্ষেতে মাছের চাষ, মৎস্য নার্সারি ব্যবস্থাপনা, নারী অধিকার ও নিরাপত্তা, রুইজাতীয় মাছের অন্তঃপ্রজনন সমস্যা ও প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ে এ পর্যন্ত ৩০,৪২০ জন সুফলভোগীকে মৌলিক প্রশিক্ষণ ও ৪২৯৬০ জন সুফলভোগীকে ফলোআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্রুড ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, অন্তঃপ্রজনন সমস্যা ও প্রতিকার বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় ৩০ জন কর্মকর্তা এবং ১৮০ জন ব্যক্তিমালিকানাধীন হ্যাচারি অপারেটর/টেকনিশিয়ানদের তিন দিন ব্যাপী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রদর্শনের লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী জেলায় উন্নত পদ্ধতিতে মাছচাষ, আয়বর্ধক কর্মসূচি, প্রদর্শনী নার্সারি ও মৎস্য খামারসহ নানাবিধ কার্যক্রম সরেজমিনে দেখানোর জন্য ইতোমধ্যে ৬৫ ব্যাচে ১৯৯৩ জন মাছচাষির স্থানীয় শিক্ষা সফর সম্পন্ন হয়েছে। লাভজনক উপায়ে পুকুর এবং বাঁওড়ে মাছচাষ কর্মকাণ্ড, জেন্ডার সচেতনতা ও উন্নয়ন এবং অন্যান্য আয়বর্ধক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের এবং তালিকাভুক্ত বিভিন্ন এনজিওর ৭৭৯ জন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এলাকাভিত্তিক কর্মঠ ও উদ্যমী মহিলাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য চাষে সহায়ক এজেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। এসব এজেন্ট স্থানীয় চাষিদেরকে প্রয়োজনের সময় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের কথা বিবেচনায় রেখে নির্বাচিত পুকুর পাড়ে সুফলভোগীদের মৌলিক চাহিদাভিত্তিক কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন নীতির আলোকে অত্র প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ

পুকুরে মাছচাষ ও মহিলাদের সম্পৃক্ততা

পুকুরে মাছচাষি দলের সকল সদস্যই মহিলা। প্রকল্প এলাকার ৪৭৬টি গ্রামে ৭৮০টি পুকুর মৎস্যচাষি দলের ১৫,৬০০ মহিলা সদস্য কর্তৃক ৯৮৬.৬ হেক্টর জলাশয়ে মাছচাষ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩.৬ মেট্রিক টন। এ পর্যন্ত গড়ে হেক্টর প্রতি প্রায় ৩.১ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। বাড়তি উৎপাদিত মাছ বিক্রি করে মাছচাষি পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে যা বেঞ্চ মার্ক উৎপাদন থেকে ৭৭% বেশি।

বাঁওড়ে মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের উন্নয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ৬০২ হেক্টর বাঁওড়ে মৎস্যচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাঁওড়সমূহে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ২০০-৪০০ কেজি হতে বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে ৮৮৯ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। কিছু কিছু বাঁওড়ে সর্বোচ্চ ১,৮০০ কেজি/হেক্টর উৎপাদন ইতোমধ্যে সম্ভব হয়েছে। বাঁওড় ব্যবস্থাপনায় সদস্যদের সচেতনতা, দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনা কাজে গণতন্ত্রের ধারা চালু রাখা এবং সঠিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পদ্ধতি অনুসরণই উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

প্রদর্শনী নার্সারি

পুকুর এবং বাঁওড়ে মাছ চাষের প্রধান শর্ত হচ্ছে পোনার সহজ লভ্যতা। মৎস্যচাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৪৭৬টি গ্রামের পুকুর মৎস্যচাষি দল ও সমাজ উন্নয়ন দলের সদস্যদের দ্বারা এ পর্যন্ত ৭৩১টি প্রদর্শনী নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বার্ষিক প্রায় ৩.৬৬ কোটি পোনার যোগান দেয়া হচ্ছে এবং তা থেকে ৭৩১টি নার্সারির মালিক বার্ষিক গড়ে ১২,২৫০ টাকা করে নিট মুনাফা অর্জন করছেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি চাষিকে ধানী

পোনার মূল্য বাবদ প্রকল্প হতে কেবল মাত্র ২,৫০০ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ব্রুড ব্যাংক

উন্নতমানের পোনা প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৮টি ব্রুড ব্যাংক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু পোনা সংগ্রহ করে নার্সারিতে প্রতিপালনের পর নিকটস্থ হ্যাচারিতে মানসম্পন্ন ব্রুড তৈরির লক্ষ্যে পোনা সরবরাহ কার্যক্রমের ফলে চাষি পর্যায়ে উন্নত ব্রুড উৎপাদনের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারি-বেসরকারি যৌথ ব্যবস্থানায় প্লাবনভূমিতে মাছচাষ

প্রকল্প এলাকায় অব্যবহৃত প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৮৯টি মধ্যম আকারের প্লাবনভূমি/ধান ক্ষেতে (১০ থেকে ২০ একর আয়তন) মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যার মোট আয়তন ১৩৫৫.৬৮ হেক্টর। এসব প্লাবনভূমি / ধান ক্ষেতে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে হেক্টর প্রতি ৭৮২ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে। ফলে, এ কার্যক্রমের আওতায় ২৬০৮ টি পরিবার গড়ে বার্ষিক প্রায় ১০,০০০ টাকা নিট মুনাফা অর্জন করছেন।

প্রায়োগিক গবেষণা

গ্রাম পর্যায়ে গবেষণালব্ধ উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মৎস্যচাষিদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চাষিদের পুকুরে উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শনীর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে বিগত অর্থ বছর পর্যন্ত ৮টি জেলার সদর উপজেলাসমূহের ২৪২টি পুকুরে ৯টি প্রযুক্তি সরেজমিনে চাষিদের শিখানো হয়েছে। ফলে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রাম পর্যায়ে সহজেই বিস্তৃত হচ্ছে।

গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা

প্রকল্পের শুরু থেকে সুফলভোগীদের চিহ্নিতকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টিসহ আর্থ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রত্যয়কে জাগরিত করে অধিক শক্তিশালী করা হয়েছে। তাছাড়া, মৎস্য বিভাগীয় এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মীদের পরামর্শে আয়বর্ধক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প ছক হিসেব অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী হতে ২২৮.৬২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় যোগাড় করার বিধান থাকলেও এ পর্যন্ত সাপ্তাহিকভাবে স্বল্প পরিমাণে সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৩৬১.০০ লক্ষ টাকার পুঁজি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প এলাকার আটটি জেলার কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর তা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থেই সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতি জেলার তালিকাভুক্ত একটি সহযোগী এনজিও এবং তাদের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত লিড এনজিও কর্তৃক সুফলভোগীদের মাঝে ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম চালু আছে। এ অর্থ ভবিষ্যতে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রাথমিকভাবে এ কার্যক্রম ১৫ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে, এনজিওদের কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রমাণিত হলে ঋণ কর্মসূচি ৪০ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প মেয়াদ শেষেও সুফলভোগীদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ প্রবাহ অব্যাহত থাকবে বিধায় মাছচাষসহ আয়বর্ধক যাবতীয় কার্যক্রমও অব্যাহতভাবে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।

সমাজভিত্তিক টেকসই মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা
(Community Based Sustainable Fisheries Management)

মোঃ মাহবুবুর রহমান খান
ড. মোহাম্মদ এ. রব
ড. এম. জি. মোস্তফা
সিবিএফএম প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract

This paper describes different dimensions of the Community-Based Fisheries Management phase 2 (CBFM-2) project that is being implemented since September 2001 in 120 waterbodies spread over 47 upazilas in 22 districts to improve livelihoods and income of the poor fishers by providing access rights and introducing better management to the waterbodies. The principal objective of the project is to organize fishers for sustainable management of the fisheries resources that would help to increase biodiversity and fish production by increasing capacity and introducing conservation measures. The purpose of the project is to influence policy makers in favor of sustainable fisheries management for pro-poor policy formulation. Preliminary assessment of the improved biological management and capacity building efforts of the community based organizations (CBOs) has begun to show positive impacts. Fish production has increased in many of the project waterbodies. Alternate livelihood opportunities and income of the beneficiary fishers have improved due to micro credit program with the intention of reducing fishing pressure. Training and dissemination activities have increased awareness of the beneficiaries and communities involved regarding importance of the conservation of fisheries resources. As a result, use of destructive fishing gears has been declining. Ban period has been observed during breeding and spawning time in the project waterbodies. Despite these positive results, the project has many challenges ahead in communicating CBFM approaches to the community leaders, local elites and administration, and key policy makers for sustainable management of the inland waterbodies.

পটভূমি

বাংলাদেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ মৎস্যজীবী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলেও আহরিত মৎস্যের পরিমাণ ও প্রজাতি বৈচিত্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মৎস্যজীবী এবং বিশেষজ্ঞ মহল এর বিশেষ কিছু কারণ সনাক্ত করেছেন, যেমন ঃ জলাভূমি ভরাট ও কৃষিজমিতে রূপান্তরের কারণে মাছের আবাসস্থল ধ্বংস, অতি আহরণ, ক্ষতিকর উপায়ে মৎস্য আহরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অপরিকল্পিত বাঁধ স্থাপন, শুষ্ক মৌসুমে জলাভূমির অধিক সংকোচন এবং ইজারা প্রথা। স্বল্প সময়ের জন্য ইজারা দিয়ে অধিক রাজস্ব আদায়ের যে সরকারি নীতি তা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও স্থানীয় মৎস্যজীবীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য মোটেও সহায়ক নয়।

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (সিবিএফএম) একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। প্রকল্পের ১ম ধাপ ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানে ১৯৯৪-২০০০ মেয়াদকালে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের যৌথ উদ্যোগে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিশ সেন্টারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯টি জলমহালে মৎস্যজীবীগণ নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে জৈবিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে ও অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য বন্টন পেয়েছে। প্রথম ধাপের অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ২য় ধাপের কার্যক্রম ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়। ওয়ার্ল্ডফিশ সেন্টার-এর কারিগরি সহায়তায় ও যুক্তরাজ্য সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এর আর্থিক অনুদানে মৎস্য অধিদপ্তর ও ১১টি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ৫ বৎসর মেয়াদী এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে স্থায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে

কর্মপন্থা সম্পর্কে সংলাপের সূত্রপাত করা এবং একটি প্রক্রিয়ায় একমত হয়ে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনা কৌশলঃ সিবিএফএম-২ প্রকল্পের মাধ্যমে বিল, হাওর, নদী ও প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাঠামো গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য মডেল উদ্ভাবন ও যাচাই করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তর, ওয়ার্ল্ডফিশ সেন্টার ও ১১টি বেসরকারি সহযোগী সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকল্পের কর্মকান্ড ২২টি জেলা ও ৪৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহযোগী বেসরকারি সংস্থাসমূহ হচ্ছে কারিতাস, বাঁচতে শেখা, বেলা, ব্র্যাক, সিএনআরএস, ফেমকম, ক্রেড, ঘরণী, প্রশিকা, শিসউক এবং এসডিসি। মৎস্য অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় সহযোগী বেসরকারী সংস্থাসমূহ জলমহাল ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরী এবং সুফলভোগীদের সচেতনতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিশ সেন্টারের সহযোগিতায় বেসরকারি সহযোগী সংস্থাসমূহ ১২০টি নির্ধারিত জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী প্রায় ২৪৭০৫ দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারকে সংগঠিত করছে। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এর মাধ্যমে ৭৮টি জলমহাল ১০ বছরের জন্য এ প্রকল্পে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭২টি জলমহালের প্রশাসনিক দায়িত্ব মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এই প্রকল্প স্থানীয় সংগঠনের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করবে এবং তাদের প্রবর্তিত জলজ সম্পদ সামাজিক ব্যবস্থাপনার অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ করবে। প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে এসব জলাভূমিতে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমন্বয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি যাচাই ও নিরূপণ করা। পাইলট কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল ও উন্নত ব্যবস্থাপনার তথ্য প্রমাণাদি যথাযথভাবে সকল পর্যায়ের মৎস্যনীতি-নির্ধারকদের অবগত ও প্রভাবিত করা। আশা করা হচ্ছে সিবিএফএম-২ হতে দেশের মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণে যৌথ ব্যবস্থাপনার একটি মডেল উদ্ভাবিত হবে এবং এর মাধ্যমে জলজ সম্পদ ব্যবহার করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা অর্জনের একটি টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে একটি নীতি নির্ধারণী আলোচনার পথ সুগম করা হবে যা হবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপযোগী স্থায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণী আলোচনা।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

প্রকল্পাধীন জলাশয়ে মৎস্য আহরণ করে এমন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে সহযোগী বেসরকারি সংস্থাসমূহ দল গঠন করেছে। বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পরামর্শক্রমে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রতিটি বিল ও নদীর জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। ২০০৫ এর জুনের মধ্যে ১২০টি জলাভূমিতে এরূপ কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি শুধুমাত্র পেশাজীবী জেলেদেরকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং যেখানে বিভিন্ন ধরনের ষ্টেকহোল্ডার আছে সেক্ষেত্রে তাদের মধ্য হতেও প্রতিনিধি নিচ্ছে। স্থানীয় সংগঠনের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের বাস্তবায়ন করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কমপক্ষে ২ জন মহিলা প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২৭টি জলমহালে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পে ন্যস্ত প্রায় অর্ধেকেরও বেশী জলাভূমি ১০টি গুচ্ছে অবস্থিত যেখানে অনেক বিল, প্লাবনভূমি ও নদী খণ্ড বিদ্যমান। বিল গুচ্ছগুলো একটি অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যার ফলে বর্ষা মওসুমে মাছ এক বিল থেকে অন্য বিলে বিচরণ করে এবং যে কোন একটিতে কোন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করলে অন্য জলাশয়ও তা থেকে উপকৃত হয়। এরকম পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিল/নদীগুলোতে সুফলভোগীদের সমন্বয়ে গুচ্ছ কমিটি গঠন করা হয়েছে। গুচ্ছ কমিটির মাধ্যমে জলমহালগুলোর সমস্যা এবং এতদসংক্রান্ত কোন বিবাদ মীমাংসা সহজতর হয়েছে।

কমিউনিটি সেন্টার

সুফলভোগী ও ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের জন্য কমিউনিটি সেন্টার তৈরী করা হচ্ছে। এ সকল কমিউনিটি সেন্টার সুফলভোগীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এ প্রকল্পের অধীনে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এপর্যন্ত মোট ৪৯টি জলাভূমিতে কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

মহিলাদের অংশগ্রহণ

স্থায়িত্বশীল মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় মহিলাদেরকেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। সামাজিক সংগঠনগুলোতে মহিলাদের অংশগ্রহণে দল গঠন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দলে ও ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, গোয়াখোলা-হাতিয়ারা বিলের সকল সুফলভোগী মহিলা।

সিবিও নিবন্ধীকরণ

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন ১২০টি জলাশয়ের মধ্যে ইতোমধ্যে ৯১টিতে গঠিত সিবিও সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর অথবা সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকীগুলি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা ডিসেম্বর ২০০৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

প্রশিক্ষণ

সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিঃ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধারাবাহিক আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিশ সেন্টার এর সমন্বয়ে এ পর্যন্ত ৬৪৯ জন সরকারি ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ২২,৮৬৪ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের জনবলকে সমর্থ করা যেন তারা সমাজভিত্তিক বা স্থানীয় সংগঠনসমূহকে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আরো লাগসই ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে। ফলে জলজ সম্পদ দীর্ঘস্থায়ীভাবে ব্যবহার করা যাবে। যা থেকে এলাকার মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগণ লাভবান হতে পারবে। প্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত ছিল ঃ

১. বাংলাদেশের মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদের ধারণা ও এর গুরুত্ব;
২. মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা, পরিবর্তনের ধারা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ;
৩. মৎস্য প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ;
৪. সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কৌশল ও মডেল;
৫. আইএফএম কৌশল এবং স্থিতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণা;
৬. জলজ আবাস পুনরুদ্ধার;
৭. মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য আইন ও নীতিমালা সংক্রান্ত ধারণা;
৮. জলজ অভয়াশ্রম;
৯. বদ্ধ ও আধাবদ্ধ জলাশয়ে পোনা মজুদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো।

আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম ও ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা

সহযোগী বেসরকারি সংস্থাসমূহ দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণদান এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করে থাকে। স্বল্প পরিসরে হলেও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী মাছ আহরণের নিষিদ্ধ মৌসুমে, মন্দা সময়ে ও মাছের আহরণ চাপ হ্রাসকল্পে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। আবর্তক ঋণ তহবিল স্থাপন করার জন্য ৬টি সহযোগী বেসরকারি সংস্থাসমূহে প্রায় ১৫২.০ লক্ষ টাকার ঋনের সংস্থান রয়েছে যার মধ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ১২৮.৫৮ লক্ষ টাকা ৩,৭১৩ জন সুফলভোগীর মাঝে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্য বিতরণ করা হয়েছে। শতকরা ১২ টাকা সুদে এই ঋণ সরবরাহ করা হচ্ছে। তাদের এই ঋণ সহায়তা প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ের পর পরবর্তী ১৫ বছরের মধ্যে মৎস্যজীবী সংগঠনের নিকট দিয়ে দেয়া হবে। বিকল্প কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য অত্র প্রকল্পের ঋণ গ্রহীতাগণকে হাঁস-মুরগী পালন, গরু মোটাতাজা করণ, ছাগল পালন, মাছ চাষ ও নার্সারি, শাক-সবজী চাষ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাত করণ ও বাজারজাত করণ, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জীবন মানের ওপর প্রভাব

প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা যে সমস্ত উপার্জনশীল কাজে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো হলোঃ শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, জাল তৈরি, দর্জিগিরী ইত্যাদি। জরীপে দেখা গেছে সিবিএফএম প্রকল্পের এই ক্ষুদ্রঋণ মৎস্যজীবীদের জীবন যাত্রার মানের উপর ধনাত্মক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মৎস্যজীবী তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছে। নগদ আয়সহ বিভিন্ন সামাজিক, প্রাকৃতিক, মানব এবং ভৌত সম্পদে ধনাত্মক পরিবর্তন এসেছে। মৌলিক চাহিদা ও খাদ্য নিরাপত্তাতে ধনাত্মক প্রভাব পড়েছে বলে মত প্রকাশ করেছে।

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা

অভয়াশ্রম

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ, পরবর্তী মৌসুমে প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পভূক্ত জলাশয়সমূহে মৎস্য অধিদপ্তর, ওয়ার্ল্ডফিশ সেন্টার ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কারিগরি নির্দেশনায় এবং সুফলভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহনে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন জলাশয়ে সিএনআরএস ৫২টি, কারিতাস ১৬টি, প্রশিকা ৪৩টি, ব্রেড ৪টি, বাঁচতে শেখা ৩২টি, ব্র্যাক ১৬টি ও এসডিসি ১টি অর্থাৎ মোট ১৬৪টি অভয়াশ্রম (৯১.৩৬ হেক্টর) স্থাপন করা হয়েছে।

মজুদ বৃদ্ধিকরণ

প্রকল্পের ১১টি আধাবদ্ধ বিলে মাছ ধরার জন্য মৎস্যজীবীরা অধিকার আদায় করে এবং যেখানে মাছ বেরিয়ে যাওয়া বেড় দিয়ে ঠেকাতে পারে সেখানে তারা বাৎসরিক ভিত্তিতে কার্প মজুদ করার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। ধুম নদী বিল ও রুইয়া-বাইসা বিল (রংপুর জেলা, ব্রাক) এবং রাজধলা বিল ও হামিল বিলের (টাংগাইল জেলা, কারিতাস) অতীত অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে মাছের উৎপাদন ১৯৯৭ সনের তুলনায় শতকরা ২৬৬ ভাগ বেড়েছে।

ক্ষতিকারক জাল নিষিদ্ধকরণ

প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত জলাশয়গুলোতে ক্ষতিকারক জাল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো সহ শুষ্ক মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে স্থানীয় লোকদের উদ্বুদ্ধ করা

হয়েছে। সিএনআরএস এবং মৎস্য অধিদপ্তর ফটকীবুু নদীতে ও সংযোগ খালে ৪৯টি আর ও বান্দাল (আর= নদী অতিক্রম করা, বান্দাল=বেড়িকেট) সরিয়ে ফেলার জন্য স্থানীয় লোকদের সাথে একসঙ্গে কাজ করেছে।

মৎস্য আবাসস্থল পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরণ ও ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন

প্লাবনভূমি মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, দৈহিক বৃদ্ধি ও বিচরণের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, রাস্তা, পুল, পানি নিষ্কাশন/সেচ অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে পরিবেশের ওপর প্রভাবের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হয়নি বিধায়, মৎস্য প্রজনন, বিচরণ ও জীবনচক্রের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নদী ও বিলের সংযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়া, জলাভূমি ভরাট এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলেও মাছের আবাসস্থলের ক্ষতি হয়। তাই মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ জলাভূমির পরিবর্তনের ফলে দ্রুত কমে যাচ্ছে। মাছের অনুকূলে আবাসস্থল প্রতিষ্ঠার জন্য জলাভূমি খনন, নদী ও বিলের সংযোগ খাল খনন, নার্সারী পুকুর প্রতিষ্ঠা, অভয়াশ্রম স্থাপন, বাধ, কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর ও সহযোগী এনজিও সমূহের মাধ্যমে ৪৯টি জলাশয়ে এ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় জনগন কর্তৃক সিংহরাগী বিল ধলেশ্বরী নদীর সংযোগ খাল (সিএনআরএস ও প্রশিকা, টাংগাইল জেলা) পুনঃখনন করার ফলে এসব জলমহালে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়। দেশীয় কার্পজাতীয় মাছগুলো পুনরুদ্ধারের ফলে সেখানে মাছের প্রজাতির বৈচিত্র্য ৪৬ হতে ৬৩ টি প্রজাতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মৎস্য ব্যবস্থাপনার সুফলের উদাহরণ

আশুরার বিল দিনাজপুর জেলার একটি জলাভূমি। ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি প্রাকৃতিক প্রজননক্ষম মাছ রক্ষার জন্য স্থানীয় মৎস্যজীবীরা ব্যক্তিগত কাঠার সংখ্যা হ্রাস করে বিলের গভীর অংশে ৮ হেক্টরের একটি স্থায়ী অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। বর্ষার শুরুতে প্রাকৃতিক মাছের প্রজননের জন্য মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। আশুরার বিলের মাছের উৎপাদন ও সহনশীল আহরণ হার (বিভিন্ন জালে) নির্ধারণ করা হয় এবং প্রাপ্ত ফলাফল মাঠ পর্যায়ে সহজ ভাবে উপস্থাপন করে দারকি ও কচাল জাল দ্বারা আহরণ হার কমিয়ে আনার পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের অধীনে প্রবহমান নদ-নদীর মধ্যে তিতাস (জি-জি অংশ), তিতাস (ক অংশ), কালী নদী, ধলেশ্বরী নদী, মইষারকান্দি বুরুনপুর, উল্কাখালী নদী ও আড়িয়াল খা নদী উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৭-২০০৪ সালের গড় মৎস্য আহরণ ১৯৯৭ সালের আহরণ থেকে যদিও বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বৎসর ভিত্তিক আহরণ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, যা প্রাকৃতিক পরিবেশ, আহরণ জনিত চাপ ও প্রতিবেশের ওপর নির্ভরশীল । প্রকল্পের ৭টি নদী ও ৩টি উন্মুক্ত জলাশয়ে ১৯৯৭ সালের মাছের উৎপাদন ২০০৪ সালের উৎপাদনের তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে ৬টি নদী ও ৩টি উন্মুক্ত বিলে টেকসই ব্যবস্থাপনা সূচিত হওয়ার ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৮১.৪২%। জলাশয়ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের তুলনামূলক পরিবর্তন চিত্র-১ এ দেখানো হলো।

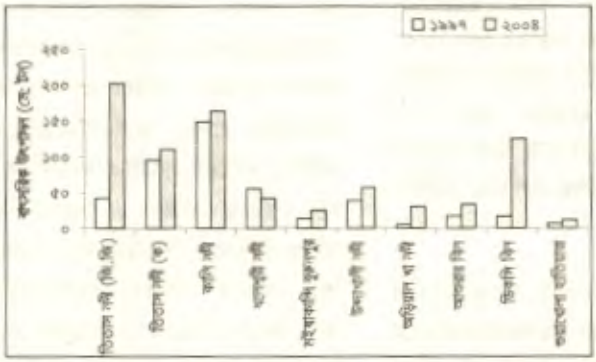

চিত্র-১: প্রকল্পের ৭টি প্রধান নদী এবং ৩টি উন্মুক্ত বিলে মাছ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

প্রকল্পের ১৪টি জলাশয়ে ১৯৯৭ সালের সহিত ২০০৪ সালের তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩১.২৪%। উন্মুক্ত বিলে টেকসই ব্যবস্থাপনা সূচিত হওয়ার ফলে প্রজাতি সংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য।

আইনি সহায়তা

সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা বেলা সামাজিক সংগঠনগুলোকে দেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রচলিত আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও আইনগত সহায়তা প্রদান করছে। এই আইনের আওতায় দেশের জলাশয়ে মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ ও মাছ ধরার সরঞ্জাম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়াদির উল্লেখ রয়েছে যা সম্পদের গুরুত্ব ও চাহিদার সমন্বয় করে সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত আদালতে গড়ানো ৬টি জলাভূমির সমস্যার আইনগত সমাধানে সাহায্য করেছে যার সবগুলো ফলাফল মৎস্যজীবীদের অনুকূলে ছিল। ক্রিমিনাল জাষ্টিস সিস্টেম এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োগ, সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার আইনগত নিরাপত্তা ও মৎস্য সংরক্ষণ আইনের ওপর তুলনামূলক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রচারণা কার্যক্রম

প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা ফেমকম, মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়াদিসহ অত্র প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর প্রচার সামগ্রী তৈরীর মাধ্যমে সহযোগিতা করছে। অডিও-ভিজ্যুয়াল সামগ্রীর মাধ্যমে নীতি-নির্ধারক ও সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অবহিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭ খন্ডের একটি মৎস্য বিষয়ক নাটক এবং মুক্ত জলাশয়ের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক ও সেচের মাধ্যমে মাছ ধরা বন্ধকরণ বিষয়ে ২টি টিভি স্পট বাংলাদেশ টেলিভিশন সহ অন্যান্য চ্যানেলে প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। লোকনাট্য কর্মসূচির আওতায় ফেমকম ১৪টি লোকশিল্পী দলের মাধ্যমে ২৫০ জন লোকশিল্পীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং ৬২৯টি সচেতনতামূলক পথনাটক এ প্রকল্প এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিবিএফএম-২ প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা বেলার সহযোগিতায় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জলাশয়সমূহের ইজারা মূল্যের ওপর আরোপিত ১৫% মূল্য সংযোজন কর (VAT) রহিত করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রম

সামাজিক সংগঠনের ওপর গবেষণা এবং কার্যক্রমের সাথে সিবিএফএম এর প্রভাবের সমন্বয় করা হচ্ছে। ভিত্তি জরিপ ও ফলাফলের প্রভাবের ওপর খানা জরিপ প্রকল্পের সব এলাকাতে এবং ১৭টি নিয়ন্ত্রণ এলাকায় সম্পাদন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ৫ টি জলাশয়ে মাছের সহনশীল আহরণযোগ্য মজুদ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং মৎস্য আহরণ মনিটরিং কার্যক্রম ৫৯টি জলাভূমিতে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের ১০টি এলাকায় মৎস্য আহরণ ও প্রজাতি ভিত্তিক আহরণ চাপ সম্মিলিত একটি গবেষণা প্রতিবেদন (খসড়া) প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ১৭টি এলাকায় পরিবার পর্যায়ে মৎস্য আহরণ ও দৈনন্দিন খাদ্যে মাছ গ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। নদী ও জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম নকশা ও দূষণের প্রভাব এর ওপর গবেষণা বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়াও সহযোগী সংস্থা বেলা মৎস্য প্রশাসন বিষয়ক নীতি, আইন ও প্রতিষ্ঠানের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রকল্প শুরুর পরপরই মৎস্যজীবী ও অন্যান্য ধরনের ষ্টেকহোল্ডারগণের সহ অবস্থান নিশ্চিতকরণের জন্য খানা জরিপ করা হয়। এরপর মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডার পরিবারের ভিত্তি জরিপ করা হয়। মৎস্য ভোগ ও আয়-ব্যয় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত দুটি জরিপ চলে আসছে। প্রকল্পের উন্নতি পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণাও চলছে। এ ছাড়া সময় উপযোগী চাহিদার ওপর সামাজিক গবেষণাও করা হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রভাব, আর্থ-সামাজিক প্রভাব, জেন্ডার সমীক্ষা, প্রকল্পের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব, জীবন-মান সংক্রান্ত সমীক্ষা এ ধরনের বিভিন্ন সামাজিক সমীক্ষা/নিরীক্ষার নিমিত্তে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিছু সমীক্ষার ফলাফল ইতোমধ্যেই নির্ণীত হয়েছে এবং অন্যান্য কিছু তথ্য বিশ্লেষণ চলছে। এই সমস্ত সামাজিক গবেষণার উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট ফলাফল মূল্যায়ন করা।

বিদ্যমান সমস্যাসমূহ

- উচ্চ ইজারা মূল্যের ফলে অনেক এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এরূপ উচ্চ ইজারা মূল্য সম্বলিত বিলগুলোর মধ্যে রাজধলা, শাকলা, শাপলা এবং হুরইল বিল উল্লেখযোগ্য।
- স্থানীয় প্রভাবশালী/মধ্যস্বত্বভোগী কর্তৃক জলমহাল ব্যবস্থাপনায় প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি হওয়ার কারণে মারা ও হাতিনা মুড়াল বিল প্রকল্প হতে হাতছাড়া হয়ে গেছে। স্থানীয় সিবিও কর্তৃক অব্যবস্থাপনা, উচ্চ রাজস্ব ও বকেয়া পরিশোধ করতে না পারায় ইতিমধ্যে শাপলা ও হুরুইল বিল প্রকল্প হতে বাদ দেয়া হয়েছে।
- সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও পদ্ধতিসমূহ স্থানীয় প্রশাসন ও মূল নীতি নির্ধারকদের অবহিত করা এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রকল্পের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

(সূত্রঃ ওয়ার্ল্ডফিশ মৎস্য আহরণ গবেষণা, ১৯৯৭ খ্রি. ও ২০০৪ খ্রি.)

মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধিকল্পে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন
(Establishment of Fish Sanctuary to Conserve & Enhance Biodiversity)

মোঃ কফিল উদ্দিন কাইয়া
মোঃ জহিরুল ইসলাম
মোঃ মঞ্জুর কাদির
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract

Bangladesh is blessed with the world's richest and most diversed inland aquatic ecosystem having a wide variety of living aquatic resources. But over the years, due to natural and man made causes, aquatic bio-diversity especially species diversity of fish and other aquatic organisms in open water, have been declining sharply. Hence it is very much essential to undertake necessary attempts for conserving and enhancing aquatic biodiversity. Establishment of aquatic sanctuary is one of the effective tools for conserving fish stock, preserving biodiversity and increasing fish production. In some cases, restoration as well as conservation of habitat may be possible by establishing aquatic sanctuary. Moreover, as a part and form of fisheries management, sanctuaries are relatively easy for user communities to implement and enforce. Considering the objectives as well nature of water bodies, sanctuaries may be of seasonal and perennial/permanent that help protect breeding and nursery ground and help produce brood fish and other fish and enhance biodiversity.

সূচনা

জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম। বাংলাদেশের প্রায় ৪.৯ মিলিয়ন হেক্টর এলাকা বছরে ৪-৬ মাস জলমগ্ন থাকে। এদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির মাছ (Rahman, 1989) এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়িসহ নানা ধরনের ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুক, শিশুক ও অনেক উদ্ভিদ রয়েছে। এছাড়া দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলে বানিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন ১২০ প্রজাতির স্বাদু ও সামুদ্রিক মাছ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান জলজ প্রাণী ও গাছপালা আছে। প্রাকৃতিক কারণে ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হওয়ায় মাছের আবাসস্থল প্রতিনিয়ত ধ্বংস ও সংকোচিত হওয়া, বিষাক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার, বিষাক্ত বর্জ্য নিক্ষেপন, নির্বিচারে/অবাধে মৎস্য আহরণ (পানি শুকিয়ে মাছ ধরা, চিংড়ি পোনা আহরণ, ক্ষতিকর মৎস্য আহরণ সরঞ্জামের অবাধ ব্যবহার, মাছের অতি আহরণ) ইত্যাদি কারণে এদেশের মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে বিপন্ন প্রায় প্রজাতির মাছ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সরকারি পরিসংখ্যান না থাকলেও IUCN (১৯৯৭)-এর লাল বইতে (Red Book) এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৫৮ প্রজাতির মাছকে বিপন্ন বা সংকটাপন্ন প্রজাতি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এসব প্রজাতির মাছসহ জীববৈচিত্র্যের সংকটাপন্ন অবস্থা হতে উত্তরণ ঘটিয়ে মৎস্য সম্পদ সমৃদ্ধির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ হলো জীবজগৎ বা জীববৈচিত্র্যকে মানুষের কল্যাণের জন্য এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের পন্থাকে অক্ষত রেখে বর্তমান প্রজন্ম তা থেকে সর্বোচ্চ তথা টেকসই সুবিধা পেতে পারে। লাগসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবজগতকে সংরক্ষণ করা সম্ভব। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

হলো কতিপয় কার্যক্রমের সমন্বয়, যেমন- কোন কাঙ্ক্ষিত জীব বা জীবদের এবং এদের আবাসন ও বংশগতিকে রক্ষা করা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, সম্পদের সহনশীল ব্যবহার, জলজ জীবের আবাসস্থল উন্নয়ন বা উপযোগীকরণ, জীববৈচিত্র্যকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার ইত্যাদি।

মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায়

প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের সমৃদ্ধি সাধন তথা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নবর্নিত উপায়ে বিভিন্ন পরিবেশে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায়-

- মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Sanctuary) স্থাপন, সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area) ঘোষণা, নো টেক জোন (No Take Zone), মেরিণ রিজার্ভ/পার্ক (Marine Reserve/Park) স্থাপন ইত্যাদি;
- এলাকা এবং জালের ফাঁসের আকার নির্দিষ্ট করণের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট প্রজাতির ডিমওয়ালা মাছ, পোনা মাছ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মাছকে সংরক্ষণ করা;
- নির্দিষ্ট জাল দিয়ে বা পদ্ধতিতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা অথবা নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা;
- নির্দিষ্ট মৌসুমে কোন নির্দিষ্ট মাছ না ধরা অথবা কোন নির্দিষ্ট জলাভূমি থেকে পরিকল্পিতভাবে আংশিক আহরণ করা ;
- কারেন্ট জালসহ বিভিন্ন ধরনের জালের এলাকাভেদে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রমের গুরুত্ব ও ভূমিকা

বর্তমানে আমাদের দেশে কার্প (যেমন-রুই, কাতল) এবং ক্যাটফিস (যেমন-পাংগাস, আইড়) জাতীয় মাছের উৎপাদন প্রায় ৫০ ভাগ কমে গিয়েছে। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ও বৈচিত্র্য হ্রাস পাওয়ায় দরিদ্র জনগণের আয় ও পুষ্টির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, গড়ে মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণ কমেছে শতকরা ১৫ ভাগ এবং চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ কমার হার শতকরা ৩৮ ভাগ (BBS 1995/2000)। মাছের অতি আহরণ, আবাসস্থল ধ্বংস, জলাভূমি ভরাট করে কৃষিজমিতে রূপান্তর, বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কালে জৈবিক প্রভাব বিবেচনা না করা, জলজ পরিবেশ দূষণ, জলাভূমিতে মানুষের ব্যাপক বিচরণ, বিদেশী প্রজাতির যথেচ্ছ চাষাবাদ, ক্রমাগত ত্রুটিপূর্ণ কৃত্রিম প্রজননের ফলে মূল প্রজাতির পরিবর্তন ও জীনগত অবনতি দেশের মৎস্য সম্পদ হ্রাসের অন্যতম কারণ। লাগসই ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি তথা জলজ জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। এই ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো- জলাশয়ে আহরণ প্রবেশাধিকার ও আহরণ প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি, আহরণ সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ, আহরণ সীমিতকরণ/নিয়ন্ত্রণ, মজুদ সমৃদ্ধকরণ ব্যবস্থাদি, (পোনা মাছ মজুদ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, আবাসস্থল উন্নয়ন, ফিশপাস/ফিস ফ্রেন্ডলী রেগুলেটর নির্মাণ), বাজার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। জলাভূমিতে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সাধারণত: ডিমওয়ালা মাছের নিরাপদ সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন, প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও পোনামাছ সংরক্ষণের জন্য করা হয়ে থাকে। মৎস্য সম্পদের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েই অভয়াশ্রম স্থাপন ও সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে অভয়াশ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

অভয়াশ্রম স্থাপন তুলনামূলকভাবে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সহজ উপায় এবং এতে স্বল্প ব্যয়ে অধিক সুফল পাওয়া যায়। অভয়াশ্রম ঘোষিত এলাকায় সারা বছর অথবা কোন নির্দিষ্ট মৌসুমে, যেমন শুষ্ক মৌসুমে বিলের অভয়াশ্রমে মাছ ধরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন আবাসস্থল হিসাবে অভয়াশ্রমে নানা প্রজাতির মাছের বংশ বৃদ্ধি ঘটে। তাছাড়াও অভয়াশ্রম অন্যান্য জলজ জীবের বংশ এবং প্রাচুর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন বা ঘোষণার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা;
- মাছের অবাধ প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা;

- নিরাপদ আশ্রয় সৃষ্টির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় বা মাছের বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ করা;
- মাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা;
- প্রাকৃতিক মৎস্য মজুদ ও সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো;
- মাছের প্রজাতিগত ও বংশগতিগত বৈচিত্র্য (Fish species and genetic diversity) সংরক্ষণ করা;
- ক্ষেত্র বিশেষে মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা।

মৎস্য অভয়াশ্রমের প্রকারভেদ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং জলাশয় ভেদে অভয়াশ্রম বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের মৎস্য অভয়াশ্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে নিচে আলোকপাত করা হলো-

- **মৌসুমি অভয়াশ্রম**

কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে প্রজনন ক্ষেত্রে প্রজনন ঘটায় এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিচরণ করে থাকে। তাই অবাধে প্রজনন ও বিচরণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট এলাকা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছের অভয়াশ্রম হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যেমন- হালদা নদীর মদুনা ঘাট এলাকা, কাপ্তাই লেকের লংগদু ও বিলাইছড়ি এলাকা। ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের জন্য মেঘনা নদীর ধলচর, কালিরচর ও মৌলভীরচর এলাকা এবং জাটকা মাছের অবাধ বিচরণের জন্য মেঘনা নদীর ষাটনল হতে হাজীমারা, নীলকমল, ভোলা ও বরিশাল জেলার কয়েকটি এলাকা এবং কুয়াকাটা হতে দুবলার চর পর্যন্ত উপকূলকে যথাক্রমে প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস পর্যন্ত বর্তমান সরকার কর্তৃক অভয়াশ্রম ঘোষণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- **সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম**

জলাশয়ের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সারা বছরের জন্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হলে তাকে সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম বলা হয়। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে অনেক হাওরের কোন কোন বিলে ২/৩ বৎসর অন্তর অন্তর পাইল ফিশারি হিসাবে মাছ ধরা হয়। এই পাইল ফিশারিকে প্রকারান্তরে সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম বলা যেতে পারে।

- **দীর্ঘ মেয়াদী বা স্থায়ী অভয়াশ্রম**

কোন কোন অঞ্চলে কোন নদী বা বিলের সম্পূর্ণ অংশে বা এর একটি সুনির্দিষ্ট এলাকায় দীর্ঘ মেয়াদে বা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। এরূপ এলাকাকে দীর্ঘ মেয়াদী বা স্থায়ী অভয়াশ্রম বলা হয়ে থাকে।

সরকারি নীতিমালার আলোকে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে ২৫৮টি মৌসুমি ও সাংবাৎসরিক মৎস্য অভয়াশ্রম এ যাবৎ স্থাপন করা হয়। স্থানীয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব অভয়াশ্রম স্থাপন ও এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তরের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত অভয়াশ্রমগুলো তুলনামূলকভাবে আয়তনে যথেষ্ট বড় আকারের। এসব ছাড়াও সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটাপন্ন মৎস্য আবাসন এলাকায় বৃহৎ আকারে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের ভাল আবাসস্থল তথা স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ;
- সারা বছর পানি থাকে এমন জলাশয় বা জলাশয়ের অংশবিশেষ;
- জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পর্যাপ্ত উপস্থিতি;
- জলাশয়ে লক্ষ্য/মুখ্য প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য্য;
- জলাশয়ে রাক্ষুসে মাছ ও শিকারী প্রাণির অনুপস্থিতি;
- জলাশয়ে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির উপস্থিতি বা পুন:আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে;
- জলাশয় সংশ্লিষ্ট এলাকার কম জনবসতি ও কম কর্মতৎপরতা বিশিষ্ট স্থান;
- জলাশয়ের দূষণ মুক্ত এলাকা।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা

মৎস্য অভয়াশ্রম হলো মাছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। লক্ষ্য মাছ আকারে যত বড় হবে তার জন্য তত বড়

আয়তনের অভয়াশ্রম দরকার। সাদা বা নদীর মাছের জন্য নদীতে এবং কাল বা বিলের মাছের জন্য বিলে এরূপ সংরক্ষিত এলাকা/অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হবে। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকার কথা বিবেচনা করে তাদের সম্মতির ভিত্তিতে অভয়াশ্রমের স্থান ও আকার ঠিক করা আবশ্যক। সাধারণতঃ নদী অথবা অন্য কোন জলাভূমির নির্দিষ্ট এমন অংশে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে কোন নির্দিষ্ট মৌসুমে অথবা সারা বছরব্যাপী মাছ ধরা নিষিদ্ধ রাখা সম্ভব। নদ-নদী বা বিলের এমন কোন গভীর অংশ বা পকেট নির্বাচন করতে হবে যেখানে তুলনামূলকভাবে স্রোত কম, পলি জমার সম্ভাবনা কম, নৌচলাচলে বিঘ্ন ঘটবে না এবং জনগণ বা অন্যান্যদের দ্বারা তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। উদ্দিষ্ট এলাকার কত শতাংশ জায়গায় অভয়াশ্রম স্থাপন করা দরকার, তা এখনো সঠিকভাবে বলা সম্ভব। বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে শুষ্ক মৌসুম আয়তনের শতকরা ৮-১০ ভাগ এলাকা সংরক্ষিত রাখা যায়। তবে প্লাবনভূমি/বিল এলাকায় এমনকি ৪০০-৫০০ বর্গমিটারের কুয়া/ডোবায় অভয়াশ্রম স্থাপন করেও সুফল পাওয়া গেছে। নির্বাচিত এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে এর চতুর্পাশে সীমানা চিহ্ন (লাল পতাকা/স্থায়ী স্থাপনা, যেমন-উঁচু বড় গাছ, গুদারা ঘাট, বাজার, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি) দিয়ে রাখতে হবে। এর ফলে অভয়াশ্রম এলাকায় প্রজননের জন্য প্রচুর ডিমওয়ালা মাছের সমাহার ঘটবে এবং পোনা মাছসহ বিভিন্ন আকারের মাছের প্রাচুর্য দেখা দেবে। এ অভয়াশ্রমের প্রভাবে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের সঙ্গে যুক্ত অপরাপর অংশে বা পার্শ্ববর্তী জলাশয়েও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিগত ষাটের দশকে এবং পরবর্তিতে আশির দশকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। কিন্তু এদের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্নের অভাবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। মূল কথা হলো, স্থানীয় মৎস্যজীবী তথা উপকারভোগীদের কার্যকর অংশগ্রহণ ছিল না বলেই এসব অভয়াশ্রম টিকে থাকে নি। ১৯৯৭ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের সিবিএফএম-১ প্রকল্পের মাধ্যমে আশুরার বিলে পুনরায় মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, জলমহাল প্রকল্প, সিবিএফএম প্রকল্প-২ ও মাচ্ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। জলাশয়ের সীমানা নির্ধারণ পূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাঁশ ও গাছের ডাল-পালা স্থাপন করে মৎস্য অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়। জলাশয়ের যে অংশে পলি জমেনা ও নৌচলাচলে বিঘ্ন ঘটে না এমন স্থানে ডালপালা ফেলা উচিত। কোন কোন প্রকল্প এলাকায় যেখানে পলি জমার কোন সম্ভাবনা নেই, এমন স্থানে গাছের ডাল-পালার পরিবর্তে কংক্রিটের তৈরি টেট্রাপড (Tetrapod) অভয়াশ্রমে ব্যবহার করা হয়।

অভয়াশ্রমের প্রভাব

বাস্তবায়িত অভয়াশ্রমের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বন্যা প্লাবিত এলাকায় এবং নদীতে মাছের টেকসই উৎপাদন এবং জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে অভয়াশ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে মৎস্য অধিদপ্তরের কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রমের প্রভাব উল্লেখ করা হলো-

- **চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প**

মৎস্য অধিদপ্তরের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের আওতায় ২০০১ হতে ২০০৩ইং সাল মেয়াদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪৫টি জলাশয়ে (নদী ও বিল) মোট ৫৩টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। ৪৫টি জলাশয়ের মধ্যে ২৭টি জলাশয়ের অভয়াশ্রম এক হতে তিন বছর ব্যবস্থাপনার পর সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীর নিকট হতে সংগৃহীত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২৭টি জলাশয়ে মাছের উৎপাদন শতকরা ১৫-২০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছের উৎপাদন প্রকল্পপূর্ব হেক্টর প্রতি বছরে ১২০ কেজি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৯.৪ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। ২৭টি জলাশয়ের মধ্যে ২৩টি জলাশয়ে মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে (শতকরা ৮৫ ভাগ)। এ সকল জলাশয়ে স্থানীয়ভাবে অবলুপ্ত এমন ২৪টি প্রজাতির মাছের পুন:আবির্ভাব ঘটেছে (প্রতি জলাশয়ে ১ হতে ৭টি প্রজাতি)। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট জলাশয়গুলোতে খুবই কম পাওয়া যেত এমন বিপন্ন ২৩টি প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি মৎস্যজীবীদের আয় বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথা জলাশয়ে প্রকৃত

মৎস্যজীবীদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মৎস্যজীবীগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

- **সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প**

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ, পরবর্তী মৌসুমে প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পভুক্ত ১২০টি জলমহালে ১৬৪টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৯৪ সাল হতে বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রমের প্রভাবে প্রকল্পের ৭টি নদী ও ৩টি উন্মুক্ত জলাশয়ে ১৯৯৭ সালের মাছের উৎপাদনের সহিত ২০০৪ সালের মাছের উৎপাদন তুলনামূলক বিশ্লেষণে জানা যায়, ঐ সকল জলাশয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা সূচিত হওয়ার ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হার শতকরা ৮১.৪২ ভাগ। পাশাপাশি প্রকল্পের ১৪টি জলাশয়ে ১৯৯৭ সালের ফলাফলের সহিত ২০০৪ সালের ফলাফল তুলনামূলক বিশ্লেষণে জানা যায়, ঐ সকল জলাশয়ে মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩১.২৪ ভাগ।

- **মাচ্ (MACH) প্রকল্প**

এটি বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প। ১৯৯৮ সালে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৬টি জলাশয়ে ৭৩টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। অভয়াশ্রম কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জলাশয়গুলোতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে শতকরা ২৩৩ ভাগ (শতকরা ১১০ হতে ৪৬৩ ভাগ পর্যন্ত)। পাশাপাশি এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাবে জলাশয়গুলোতে স্থানীয়ভাবে অবলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতি ৮ থেকে ১০টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **নতুন জলমহাল নীতিমালাভুক্ত উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলমহালে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প**

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীনে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি ১৯৯৯ সালে শুরু হয় এবং ২০০৫ সালের জুন মাসে এর কার্যক্রম শেষ হয়। প্রকল্পের আওতায় ১১টি জলমহালে ১১টি মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল জলাশয়ে কমবেশি ৩ বছর অভয়াশ্রম কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর ১৪০৭ বাংলা সনের মাছের উৎপাদনের সাথে ১৪১০ বাংলা সনের মাছের উৎপাদন তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে জানা যায়, এ সকল জলাশয়ে মাছের উৎপাদন শতকরা ১৭ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহার

আমাদের দেশে এখনো বিদ্যমান মাছের প্রজাতিসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করা না হয় তবে দেশের পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তাই এক্ষণে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের স্বার্থে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, বিল, প্লাবনভূমি, উপকূলীয় অঞ্চলের উপযুক্ত স্থানে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের মাধ্যমে অভয়াশ্রম স্থাপন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমও গ্রহণ করা দরকার।

জীবিকার নিরাপত্তার জন্য উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন প্রকল্প ও মৎস্যজীবীদের প্রত্যাশা

(Empowerment of Coastal Fishing Communities for Livelihood Security : Expectations of the Fishers)

জাফর আহমেদ
ড. এ কে এম নওশাদ আলম
মৎস্য অধিদপ্তর

Abstract

Marine fisheries resources of Bangladesh provide livelihoods to lakhs of coastal fishers who are ranked among poorest of the rural poor. However, a declining trend in marine fish production is noticed in recent years. Fishing efforts per unit of catch is increasing and the catch is highly dominated by the juveniles and young ones. Owing to all these, the livelihoods of poor coastal fishers are virtually at stake. As a result, in their desperate bid to survive, they put further pressure on fragile coastal fisheries resources. They try to fish whatever is available in the water by resorting to use of highly destructive gears and fishing practices. At this stage, it is critically important that all round efforts are made to rehabilitate the resource base and avoid any irreversible changes to that.

To improve the such sitution a project titled "Empowerment of Coastal Fishing Communities for Livelihood Security" is being implementing by the Department of Fisheries. The project is following Sustainable Livelihood Approach (SLA) where the intervention is aimed at different dimensions. It has taken a holistic view of the confronting problems and issues and hence attempt is being made to assist the resource users in developing their capacity to securing their livelihoods. Finally their enhanced capacity and capability are directed towards rehabilitation of resources. All round efforts are being made to make them realize that they are not only users of the resources but custodian of the resources as well. Poor compliance level of fish acts and regulations clearly indicate that the government alone may not be able to enforce those.

ভূমিকা

বিগত দশ বছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও মৎস্য উৎপাদনের পরিধি প্রায় তিনগুন বিস্তৃত হলেও উন্মুক্ত জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য আহরণ যৎ-সামান্য বাড়লেও তার পুরোটাই পরিমাণগত বৃদ্ধি, গুণগত নয়। অধিক হারে ক্ষতিকর জাল ব্যবহারের মাধ্যমে ছোট পোনাসহ প্রায় সব মাছ ধরে ফেলার কারণে আহরিত মাছের মোট পরিমাণ বেড়েছে সত্য, কিন্তু তা ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের সামুদ্রিক মজুদ, যার ক্ষতিকর প্রভাব ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে, তা একই হারে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো সমুদ্রে ধরার মতো পোনা মাছটিও অবশিষ্ট থাকবে না। নিরতিশয় ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার ১০ লক্ষ উপকূলীয় মৎস্যজীবী হারাবে তাদের একমাত্র বাচার অবলম্বন-কর্ম সংস্থানের পথ।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে মোট ধৃত সামুদ্রিক মাছের শতকরা ৯০ ভাগ আসে ক্ষুদ্র-আয়তনের আর্টিসনাল আহরণ থেকে। নিঃস্ব ও সুবিধাবঞ্চিত উপকূলীয় সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের জীবিকার সংস্থান করছে এই ক্ষুদ্র মৎস্য আহরণ-শিল্প। তদুপরি, তাজা মাছের অভ্যন্তরীণ চাহিদাসহ হাঁস-মুরগি ও মৎস্য খামারের প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানের মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় এই ক্ষুদ্র-মৎস্য আহরণ শিল্পের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার বিরাট ভূমিকা রাখার পরও উপকূলীয় জেলেসম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিন খারাপ থেকে আরো খারাপতর হচ্ছে। যারা মাছ ধরেন, সমুদ্রে যান, আমরা তাদের বলি প্রাথমিক উৎপাদক- তারা সেই